International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.97-145
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.97-145

নজরুলের প্রকৃতি সন্দরর্শনঃ কবিতা ও গল্পে চৈতন্যের সহোদর

ড. কমল আচার্য
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয়, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা

Abstract:

The appeal of nature is spontaneous and eternal in poetry. The purpose of applying the first conscious nature in the works of Bengali literature was to express the frustration of a large group. Most of the Vaishnava terms and prakriti have become a wonderful expression of the metaphorical Nisarga image. This is where they differ from the modern individual main policy poetry. In the poems of Ishwarishbra, Madhusudan Dutta, Hemchandra Bandyopadhyay, Biharilal Chakraborty, nature will become an identity in a unique style in its beautiful content and expression.

"Pranay karechi ami prakriti ramani sane,
Jahar labanyachata mohita kareche mane."

From here, the pure western romantic view began to reflect in Bengali poetry and in the 19th century, under the influence of western literature, the nature of Bengali poetic literature began to be imposed with a new spirit. Abandoning the childish fascination and simple sense of wonder, 19th century poets did not begin to impose principles and humanity on nature. The full modernity and dialect of the nature consciousness of the 19th century can be observed in 'Sardamangal' o 'Saadder Asan' and therefore in the poem 'Sonar Tari' 'Basundhara', the mysteriousness of Rabindra's plan and with it the power of a huge force of life is blessed by the blessed poet Nazrul. Nazrul is basically a poet and a very emotional romantic poet. So nature influenced his artist psyche in many ways. His stories and thoughts of nature are the lifeblood of life and its radiance. Again, let's not forget that the price of Nazrul's extreme romanticism was rebellion. The nature of this rebellion is unique. So his poetry can be seen on the one hand strong fiery fiery language on the other side soft and muted music like this characteristic of Gunjaran poetry, his story has two streams but two streams of the same romantic flow divided by the dilemma of the artist is immersed in the same consciousness. And based on this source, the purpose is to contextually investigate how far the poet soul of the storyteller has become meaningful in the creation of truth with the nature of the storyteller Nazrul's stories. Of course, with this, we have to be aware of the tribal division of the stories. In Nazrul's stories, nature is sometimes calm, snug, gentle,

sometimes full of indifferent. Sometimes the subject of his story is tender, sweet love, sometimes the pain of distant love, sometimes the complex spiral of love and self-loss in cruel forms. Although it is possible to divide Nazrul's stories into various categories on the subject, it is never possible to separate them completely. Because the signs of multiple expressions can be found in each story keeping in mind that the stories have not been divided into several groups and analyzed...

Part –A: Judhabikshata O Morurukha Prakritir Rudrasundar Premer Rupayan
Part – B: Prakriti O Premanubhav
Part – C: Prakriti o Manabsattar Achyedya Rup
Part – D: Biswaprakriti O Shilpi Prakriti

Keywords: Soundarjavisar, Satya-Sundar, Biswaprakriti, Indriyaghanata, Dahandipti, Bastutantrata, Satyadarsha, Soundarjadanshan, Pratiti(Impression), Swapnamadir.

‘মোর প্রিয়া হবে, এসো রাণী
দেবো খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাবো তৃতীয়া তিথির
চৈতি চাঁদের দুল।’

‘প্রকৃতি’ শব্দের অর্থ দ্ব্যর্থক। বৃহতার্থে প্রকৃতি বিশ্বভূমা পর্যায়বাচক শব্দ। বিশ্ববিধান, বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বমানব সমস্তই এতে লগ্নিত। সীমায়িত অর্থে প্রকৃতি সাধারণতঃ তার সঙ্কীর্ণ বৃত্ত অতিক্রম করে ব্যাপক অর্থেই প্রযুক্ত হয়। আর তা নির্ভর করে উদ্দিষ্ট কবির জীবনবোধ সম্পৃক্ত অনুভূতির গভীরতার ওপর। আসলে কবির কল্পনায় প্রকৃতির সৌন্দর্য জীবনানুগ অর্থে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। কাব্য সাহিত্যে প্রকৃতি হয় তাই তাৎপর্যদ্যোতক। সমালোচক যথার্থই বলেন-

‘প্রকৃতির একটা অসুবিধে এই যে, ঐ একটি মাত্র শব্দের দ্বারা আমরা সব কিছুই বোঝাতে পারি, আবার অবস্থা বিশেষে তার একেবারে অর্থহীন হবারও বাধা নেই। যা তার মধ্যে নেই, আর থাকতেও পারে না, তেমনি কোনো গুণ প্রকৃতিতে আরোপ করে নিয়ে তবেই মানুষ তাকে অর্চনা করতে পারে।.....যারা ঐতিহাসিক অর্থে রোমান্টিক, তাদের কাছে প্রকৃতি ও ভূ-দৃশ্য প্রায় সমার্থক ছিল, অরণ্য, পর্বত ও নির্ঝরণীর এক সন্নিপাতকে মানুষের ত্রাতা বলে ভেবেছিলেন তাঁরা। ... যুক্তিবাদীরা প্রকৃতির কাছে বুদ্ধির আশা করেছিলেন, আর রোমান্টিকের প্রকৃতি ছিল হার্দ্যগুণের অফুরন্ত ভাণ্ডার, যা কিছু স্নিগ্ধ, সুখদ ও কল্যাণকর, রুশো তারই নাম প্রকৃতি দিয়েছিলেন।’[১]

স্বভাব কোমল রোমান্টিক কবি-সাহিত্যিকদের হৃদয়ও তাই প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় আপনিই আপ্লুত হয়। প্রাণবন্ত প্রাণোচ্ছল মানুষের মতোই প্রকৃতি, অনাদিকাল ধরে যেন তার প্রাণধারা নিয়ে প্রবাহিত। সমালোচক মন্তব্য করেন-

‘প্রকৃতির পাঠাগারেই মানুষ যথার্থ শিক্ষালাভ করে। প্রকৃতির মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্যের যে নিত্য প্রস্রবণ বয়ে চলেছে এতেই মানুষের চিত্ত স্নাত, পবিত্র ও সমুন্নত হয় এবং তার সকল দুঃখবেদনার উপশম ঘটে।’[২]

আসলে প্রকৃতির প্রতি অগাধ ও অকুণ্ঠ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসবশতঃ দেশকাল নির্বিশেষে কবির সাথে প্রকৃতি একপ্রকার আত্মিক যোগ স্থাপন করেছে। কবিরা একে অনুভূতিশীল ও কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। এর ফলে রোমান্টিক কাব্যধারায় প্রকৃতি এক বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং প্রকৃতির আবেদন কাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত ও চিরন্তন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদগুলোতেই প্রথম সচেতন রূপকার্থে প্রকৃতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি প্রয়োগের উদ্দেশ্য সেখানে বৃহৎ গোষ্ঠীর ব্যাকুলতা প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রকৃতি চেতনাও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের ভাববাহী নয়, সেখানে বৃহৎ গোষ্ঠীর আকুলতায় হয়েছে তা উদ্ভাসিত। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ পদেও প্রকৃতি হয়ে উঠেছে রূপকাত্মক নিসর্গ-চিত্তের (নিসর্গ-চিত্রের।) অপরূপ প্রকাশ। আধুনিক ব্যক্তিপ্রধান গীতিকাব্য থেকে এখানেই তাদের স্বাতন্ত্র্য।

ঈশ্বর গুপ্তের ষড়ঋতু বিষয়ক কবিতাবলী, মধুসূদনের 'দেবদোল', 'বটবৃক্ষ', 'বিজয়াদশমী' প্রভৃতি কবিতাবলী থেকে নিসর্গ কবিতার বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছে। তারপর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী' (১৮৭০) ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২) কাব্যে আত্মলীন দৃষ্টিতে অনুভূতিশীল নিসর্গচিত্র অঙ্কন করতে দেখা যায়-

'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে,
যাহার লাবণ্যছটা মোহিত করেছে মনে॥'[৩]

কবির এই বর্ণনা থেকেই বাংলা কাব্যে বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে। এই পাশ্চাত্য রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষণ-অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে রহস্য সন্ধানের চিরন্তন প্রকাশ, অপরিচয়ের রহস্য মিশিয়ে প্রকৃতি রমণীর সৌন্দর্যোপভোগের ব্যাকুলতা, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে দূরত্বের আবিষ্কার ও তা উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস, রোমান্টিক অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত এবং অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে প্রকৃতি সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় ও প্রেম সাধনা। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রকৃতি চেতনায় এরূপ নব নব ভাবধারা আরোপিত হয়। শিশুসুলভ মুগ্ধ দৃষ্টি ও সরল বিস্ময়বোধ ত্যাগ করে এই শতকের কবিরা প্রকৃতিতে নীতি ও মানবতা আরোপ করেন। তারপর আপন হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে প্রকৃতির সুরটি নিয়েছেন বেঁধে। সেখানে প্রকৃতি আর কবির অনায়ত্ত নয়, সে মানুষের সাথী হয়েছে। কবিরা প্রকৃতিতে কেবল আনন্দই সন্ধান করেননি, হৃদয়-বেদনার সমর্থনও পেয়েছেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে উনিশ শতকের প্রকৃতি চেতনার এই যে পূর্ণাঙ্গ আধুনিকতার অরুণাভাস লক্ষ্য করা যায়, তাই ক্রমশঃ রবীন্দ্র পরিকল্পনার রহস্যময়তার সঙ্গে এক বিপুল প্রাণপ্রবাহিণী শক্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সমালোচক বলেন-

'রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকৃতি কবিতা নবীন অর্থ গৌরবে ও নবতর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ববর্তী কবিদের প্রকৃতি উপাসনার সকল সুফল তাঁহার কাব্যে ধরা দিয়াছে।'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গত শতকের প্রকৃতি সাধনার চূড়ান্ত ফল। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধনের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিয়াছেন। এই প্রেমের প্রকাশেই প্রকৃতি কবিতা নবজন্ম লাভ করিয়াছে।'[৪]

-আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের 'ভোরের পাখি' বিহারীলালের কণ্ঠে গীতিকাব্যের যে প্রভাতী সঙ্গীত শোনা গিয়েছিল, তাই ক্রমশঃ কল্পনার রহস্যময়তায় প্রবাহিত হয়েছিল যেন এই প্রাণপ্রবাহিণী শক্তিতে,-'আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ।' বিশ্ব প্রকৃতির এই সর্বগ্রাসী প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সর্বসত্তাকে আলোড়িত ও মথিত করেছে। মথিত করেছে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য কবি নজরুলকেও। আসলে কোনো কবি-মানসই প্রকৃতির প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। নজরুলও মূলতঃ কবি এবং অত্যন্ত আবেগপ্রবণ রোমান্টিক কবি। তাই প্রকৃতি তাঁর শিল্পী-মানসকে বিভিন্নভাবেই প্রভাবিত করেছে। তাঁর গল্পগুলিও প্রকৃতি ভাবনার সঞ্জীবনী প্রাণশক্তির সতেজতায় ভাস্বর।

নজরুলের চরম রোমান্টিকতার মূলে ছিল বিদ্রোহ। অবশ্য এই বিদ্রোহের স্বরূপ ছিল, 'মম, এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।' তাই তাঁর কবিতায় দেখা যায় একদিকে প্রবল নির্ঘোষ ও অগ্নিস্রাবী ভাষা, অন্যদিকে কোমল ও নিভৃত সঙ্গীত গুঞ্জরণ। কবিতার এই বৈশিষ্ট্যের মতো তাঁর গল্পেরও দুটি ধারা। কিন্তু দুটি ধারা একই রোমান্টিক প্রবাহের দ্বিধাবিভক্ত রূপে শিল্পীর অভিন্ন চেতনায় অন্তলীন। আর, এই সূত্র ধরে গল্পকার নজরুলের গল্পগুলির ওপর প্রকৃতির অনুষঙ্গে গল্পকারেরই কবি-আত্মা কতদূর গল্পের ভাব-সত্য নির্মাণে সার্থক হয়ে উঠেছে তা প্রসঙ্গক্রমে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। অবশ্য এর সঙ্গে গল্পগুলির গোত্র বিভাজন বিষয়েও সচেতন থাকতে হয়েছে। নজরুলের গল্পে প্রকৃতি কখনো শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমল, কখনো ঔদাসীন্যে ভরা। কখনো তাঁর গল্পের বিষয় কোমল মধুর প্রেম, কখনো বিধুর ভালবাসার বেদনা; কখনো আবার প্রেমের জটিল, সর্পিল, নিষ্ঠুররূপে আত্মহারা। বিষয়ের দিকে তাই নানা শ্রেণীতে নজরুলের গল্পগুলিকে ভাগ করা সম্ভব হলেও কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাগ কখনোই সম্ভব নয়। কেননা, একই গল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় একাধিক ভাব সূত্রের লক্ষণ। এই কথা মনে রেখেই কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করে গল্পগুলি বিশ্লেষণে আসা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে মোটামুটি চারটি পর্বাঙ্গে তাঁর গল্পগুলির পর্যায়ভিত্তিক আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে-

পর্বাঙ্গ-ক: যুদ্ধ বিক্ষত ও মরুরুক্ষ প্রকৃতির রুদ্রসুন্দর প্রেমের রূপায়ণ।

পর্বাঙ্গ-খ : প্রকৃতি ও প্রেমানুভব।

পর্বাঙ্গ-গ: প্রকৃতি ও মানবসত্তার অচ্ছেদ্য রূপ।

পর্বাঙ্গ-ঘ : বিশ্ব প্রকৃতি ও শিল্পী প্রকৃতি।

পর্বাঙ্গ-ক

যুদ্ধ বিক্ষত ও মরুরুক্ষ প্রকৃতির রুদ্রসুন্দর প্রেমের রূপায়ণ:

"বাজে মৃত-সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝমঝম্
নাচে ধূর্জটি সাথে প্রমথ ববম বম্বম্।
লাল লালে লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের
ওঠে ডঙ্কার, রণ-ডঙ্কার,
নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের।
ছোটে রক্ত ফোয়ারা বহ্নির বাণ রে!"

যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিবেশে ও প্রকৃতির রুক্ষ পরিবেশেও নজরুল তাঁর লেখক ব্যক্তিত্বের ও জীবনাগ্রহের রোমান্টিক প্রকাশ দেখিয়েছেন। ভাষায় ও গদ্য ভঙ্গির মধ্যে গল্পকার পরিণামী ব্যঞ্জনা প্রদানের তাগিদে তাঁর কবি প্রাণের মেজাজকে সেখানে সহজ স্বীকৃতি দান করেছেন। যেমন-'ব্যথার দান', 'হেনা', 'রাক্ষুসী' ও ও 'স্বামীহারা'। এই গল্পগুলিতে গল্পকার নজরুলের ব্যক্তি-মানসের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর প্রেম-বিরহের মাধুর্য প্রকাশবাহী জীবন সমালোচনা, কবির আবেগঘন পৌরুষ সমন্বিত গদ্য প্রণয়নে হয়েছে সমুজ্জ্বল।

'হেনা' গল্পে দেখা যায়, ফ্রান্সের সিন নদীর তীরস্থ যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ঙ্করতা প্রকৃতির নির্মল পরিবেশকে বিষিয়ে দিয়েছে। সেই যুদ্ধভূমিতে নায়ক সোহরাবের হৃদয় দিয়ে নজরুল তাঁর কবি-আত্মার মানবিক অনুভূতিগুলি প্রকাশ করেছেন এই হৃদয়গ্রাহী ভাষায়-

"আগুন তুমি ঝর-ঝম্ ঝম্ ঝম্। খোদার অভিশাপ, তুমি নেমে এসো ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মতো হয়ে ঝুপ-ঝুপ-ঝুপ্। ইসরাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিঃসাড় করে দিয়ে ওম্ ওম্ ওম্। প্রলয়ের বজ্র, তুমি কামানের গোলা আর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ফাটো ঠিক মানুষের মগজের ওপরে দ্রুম্-দ্রুম্-দ্রুম্। আর সমস্ত দুনিয়াটা সমস্ত আকাশ উল্টে ভেঙে পড়ো তাদের মাথায়, যারা ভালবাসায় কলঙ্ক আনে, ফুলকে অপবিত্র করে।"[৫]

-গল্পকার নজরুলের প্রকৃতিকে এইভাবে মানবিক বর্ণনার মধ্যে মিলিয়ে দেবার এবং যথোচিত বৈপরীত্য সৃষ্টির কৌশল, কবি নজরুলের নিম্নোধৃত পঙ্ক্তিগুলিতে যেন এইভাবে বিধৃত-

"যে আকাশ হ'তে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টিধারা,
সে আকাশ হ'তে বেলুন উড়ায়ে গোলা গুলি হানে কারা?
উদার আকাশ বাতাস কাহারা
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা?
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা কার কামান?
হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত? হবে না প্রতিবিধান?"[৬]

মানুষ অমৃতের সন্তান। আলো ও বৃষ্টিধারা সদৃশ ঈশ্বরের করুণা-আশীর্বাদ ঝরে পড়ে সেই অমৃতের সন্তানের ওপর। কিন্তু সেই অমৃতের পুত্ররাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, মেতেছে আজ পারস্পরিক খুনোখুনির হিংসায়। 'খোদার অভিশাপ' সদৃশ অমানবিক এই অকল্যাণকর হিংসার বিরুদ্ধেই, শান্তির কামান দেগে, ঈশ্বর ঘটাবেন-অসত্যের দৈত্য-মুক্তি। নায়ক সোহরাবের কল্যাণকামী চিন্তার মধ্য দিয়ে, গল্পকার নজরুলও সেই অকল্যাণকর অসুন্দরকে ধ্বংস করতে চান সৈনিকের বিদ্রোহে। তারপর সন্ন্যাসী হয়ে সেই অকল্যাণের ওপর সত্য সুন্দরের ওঙ্কারধ্বনি শোনাতে চান যেন এইভাবে-

"আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক
... ...
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পানির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,

আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব নাদ প্রচণ্ড
... ...
আমি উন্মন মন উদাসীর
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর!
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের
আমি অবমানিতের মরম বেদনা
বিষজ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের।"[৭]

অবমানিতের মর্ম-ব্যথাকে, তার বিষ-জ্বালাকে নিজের বুকে ধারণ করে, কবি নজরুল এইভাবেই হয়ে ওঠেন নীলকণ্ঠ কবি। সত্য-সুন্দর প্রতিষ্ঠায় তিনি একদিকে সৈনিক, অন্যদিকে সন্ন্যাসী। যেখানেই তিনি দেখেছেন মানবিকতার অবমাননা, সেই কুৎসিত অসুন্দরের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী মনটি যেন হয়ে ওঠে পিনাক পানির ডমরু ত্রিশূল, কিংবা ধর্মরাজের দণ্ড, কিংবা ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার। এইভাবে মানবিক প্রেমের সত্য সুন্দর প্রতিষ্ঠায় যে কবি নিজেই হয়ে ওঠেন বজ্রের মতো অসত্যের বিনাশকারী, সেই কবিই অমানবিক কুৎসিত অসুন্দরের ওপর বর্ষণ করেন কল্যাণের ঈশান-বিষাণেও ওঙ্কারধ্বনি। কবি নজরুলের এই সর্বকল্যাণকামী ওঙ্কারধ্বনিই যেন 'হেনা' গল্পের গল্পকার নজরুলের-

"খোদার অভিশাপ, তুমি নেমে এসো ঐ নদীর বুকের জমাট বরফের মতো হয়ে ঝুপ-ঝুপ্-ঝুপ্। ইস্রাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিঃসাড় করে দিয়ে ওম্-ওম-ওম্।" -এই কল্যাণমন্ত্রের ভাবসাদৃশ্যবাহী হয়ে ওঠে। আর প্রকৃতির অনুষঙ্গে এখানে যে উপমা ও চিত্রকল্প নজরুল ব্যবহার করেছেন, তাতে এই কল্যাণমন্ত্রের ভাবসাদৃশ্য তাঁর সাহিত্যের দুই ধারা গল্প ও কবিতাকে, শিল্পীর একই চৈতন্যের সহোদর হিসেবে আখ্যাত করলে অসঙ্গত হয় না।

গল্পকার নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিন বছর করাচির সৈন্য শিবিরে ছিলেন। সেখানেই শুরু তাঁর সাহিত্যচর্চা-বিশেষ করে গল্প রচনা। সুতরাং, নজরুলের তরুণ ভাবপ্রবণ মনে যুদ্ধ গভীর রেখাপাত করেছে এবং গল্পেও তার প্রতিফলন পড়েছে। অবশ্য, নজরুলের প্রথম দিকের প্রায় প্রতিটি গল্পেই যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও (বিশেষ করে 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'পরীর কথা', 'হেনা', 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী') গল্পগুলির মর্মসত্য আদৌ যুদ্ধ বিষয়ক হয়ে ওঠেনি। 'ব্যথার দান' গল্পেও যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিবেশ নায়ক দারার প্রেম-বিরহের স্মৃতি-মাধুর্য উপলব্ধিকে উজ্জীবিত করে।-

"সেদিন ফাগুন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে ফুলে-ফুলে-পাতায়। ....আর সবচেয়ে বেশি করে তরুণ-তরুণীদের বুকে।

আঙুরের ডাঁশা থোকাগুলো রসে আর লাবণ্যে ঢলঢল করেছে পরীস্তানের নিটোল স্বাস্থ্য ষোড়শী বাদশাজাদীদের মতো। নাশপাতিগুলো রাঙিয়ে উঠেছে সুন্দরীদের শরম রঞ্জিত হিঙুর গালের মতো। রস-প্রাচুর্যের প্রভাবে ডালিমের দানাগুলো ফেটে ফেটে বেরিয়েছে কিশোরীদের স্ফুরিত টুকটুকে অধরের মতো। পেস্তার পুষ্পিত ক্ষেত্রে বুলবুলদের নওরোজের মেলা বসেছে। আড়ালে আবডালে বসে কোয়েল আর দোয়েল বধূর গলা সাধার ধুম পড়ে গিয়েছে, কি করে তারা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাদের তরুণ স্বামীদের মশগুল

করে রাখবে। উদ্দাম দখিন হাওয়ার সাথে ভেসে আসা একরাশ খোশ-বুর মাদকতা আর নেশায় আমার বুকে তুমি ঢলে পড়েছিলে। ‘শিরাজ বুলবুল’-এর দিওয়ান পাশে থুয়ে আমি তোমার অবাধ্য, দুষ্টু এলোচুলগুলি সংযত করে দিচ্ছিলাম, আর আমাদের দু’জনারই চোখ ছেপে অশ্রু বয়েই চলেছিল।"[৮]

বসন্তের সমাগমে প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনানুরাগের আবেগ চঞ্চল রোমান্টিক অনুভূতি এখানে কাব্যশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দুটি তাজা তরুণ-তরুণীর ইন্দ্রিয়ঘন উত্তপ্ত হৃদয়, প্রকৃতির উদ্দীপনাতেই তৈরি করেছে মিলন পরিবেশ।

"বসন্ত এল এল রে।
পঞ্চম স্বরে কোকিল কুহুরে
মুহু মুহু কুহু কুহু তানে।
বেণুকার বনে বাঁশি বাজে
বনমালী এল বন মাঝে।
নাচে তরুলতিকা যেন গোপ গোপিকা
রাঙা হয়ে রঙের বানে।
পিউ পিউ ডেকে ওঠে পাপিয়া মহুল,
পলাশ বন ব্যাপীয়া,
সুরভিত সমীরণ চঞ্চল উন্মন
আনে নব যৌবন প্রাণে।"[৯]

নব যৌবন প্রাণে যে মিলনের আকুতিতে উন্মনা, প্রকৃতির বুকে সেই মিলনানন্দের পরিবেশেও উভয়েই হয়েছে অশ্রুভারাতুর। মিলনের আনন্দঘন প্রেমাশ্রু ঝরলেও নিয়তির অমোঘ বিচ্ছেদ কিন্তু দূরে সরিয়ে নিল দু’জনাকে। তারপরেও বুকে একরাশ ব্যথা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আজহার সেই মিলন পরিবেশে। হঠাৎ যখন তার চেতন হলো, তখন দেখলো-

"তখনও বসন্ত উৎসব তেমনি চলেছে, শুধু তুমি নেই। দেখলুম, ক্রমেই তোমার আলতা ছোবানো পায়ের পাতার পাতলা দাগগুলি নির্ঝরের কূলে কূলে মিশিয়ে আসছে, আর রেশমী চুড়ির টুকরোগুলো বালি ঢাকা পড়েছে।"[১০]

আজহার উপলব্ধি করলো কঠিন বাস্তবকে। দুনিয়ার কতরকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাও যে উপভোগের মতো-এই সত্য উপলব্ধি করে বেদৌরার ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকে ভুলে যেতে চাইলো সে। এই ভুলে যাওয়া বেদৌরার আলতা ছোবানো নির্ঝরের কূলে মিশে যাওয়া কিংবা তার রেশমী চুড়ির টুকরোগুলো বালি ঢাকা পড়ে যাওয়ার ব্যঞ্জনা বহন করছে। প্রেমের এই বিচ্ছেদ মাধুর্যের উপলব্ধিতেই আজহার গৌরবান্বিত। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে মানব মনের এই যে শাশ্বত উপলব্ধির বর্ণনা আজহারের জবানীত গল্পকার নজরুল দিলেন, তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে নিম্নোদ্ধৃত পঙক্তিগুলিতে-

"জনমে জনমে আমি রূপ ধরে আসি গো
তোমারই বিরহে কাঁদিতে
রাহুর মত আমি আসি না

বাহু পাশে বাঁধিতে।
আমি ফুলের মধু চাই, ছিড়ি না ফুল গো,
দূরে রহি গাহি গায় বন বুলুল্ গো,
মনোবনে আছে তব নন্দন পরিজাত
আমি তারি পূজারী।"[১১]

নজরুল তাঁর রোমান্টিক কবি কল্পনায় তাঁর মানস-প্রিয়ার প্রেম যাজ্ঞা করেন, কিন্তু বাহু পাশে আবদ্ধ করে তাকে কালিমালিপ্ত করতে চান না। তিনি মধুর পিয়াসী। কিন্তু ফুলকে ছিঁড়ে সেই মধুপানে তৃষ্ণা মেটাতে চান না। তাঁর পবিত্র মনের নন্দন কাননে প্রেমের যে পারিজাত আছে, সেই ফুল দিয়েই তিনি প্রেমের বিরহ ব্যথার নিত্য পূজা করেন। 'ব্যথার দান' গল্পে আজহারের বিরহের এই মাধুর্য উপলব্ধিতেই গল্পটি গীতিকাব্যের ব্যঞ্জনায় যেন ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তার অর্থ এই নয় যে, গীতিকাব্যের আঙ্গিকে প্রকাশিত ব্যঞ্জনাবহুল করুণ জীবন-দর্শনই ছোটগল্পের শিল্পগুণ বৃদ্ধি করে। আসলে নজরুলের কবি আত্মা প্রকৃতির আঙিনাতেই তাঁর বিরহ আর্তিকে ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত প্রেক্ষাপট হিসেবে নির্বাচন করেছে। তাঁর গল্পে বাস্তব সমস্যা বা দ্বন্দু জটিলতার চেয়ে ভাবধর্মিতার প্রাধান্য রয়েছে বলে প্রকৃতি তাঁর কবিতার মতোই গল্পেরও উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এর ফলে কোথাও ছোটগল্পের শিল্পরূপ হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নজরুল শাশ্বত জীবন সত্যটিকে তাঁর কবি-প্রাণ দিয়ে, অবেগমুখর দৃষ্টিকোণ থেকেই আস্বাদনীয় করে তুলতে পেরেছেন। আর সেখানেই 'ব্যথার দান' গল্পে নজরুলের কবি-আত্মা গল্পকারের শিল্পী-আত্মায় মিশে যেন একাত্ম হয়ে গেছে।

'হেনা' গল্পে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসরূপ নায়ক সোহরাবের দৃষ্টিতে গল্পকার নজরুল দেখেছেন। কখনো ভর্দুন ট্রেঞ্চে (ফ্রান্স), সিন নদীর ধারে তাঁবুতে (ফ্রান্স), কখনো প্যারিসের পাশের ঘন বনে (ফ্রান্স), কখনো বা হিন্ডেনবার্গ লাইনে নায়ক সোহরাব যুদ্ধের বিভীষিকাময় জীবন যন্ত্রণা কখনো যোদ্ধার দৃষ্টিতে, কখনো কবির কল্পলোকে, কখনো বা হেনা নামক এক ফরাসী কিশোরীর কল্প-নায়িকার সঙ্গে প্রেম-মাধুর্যের গল্প-গাথায় বর্ণনা করেছেন। আর এই বর্ণনায় আমরা সোহরাবের অন্তরালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনের সৈনিক, হাবিলদার নজরুলকেই খুঁজে পাই কথাকার রূপে। গল্পটিতে সোহরাবের কবিত্ব স্বভাবী বর্ণনা প্রকৃতির যে অনুষঙ্গ এনেছে, তাতে গল্পকার নজরুল ও কবি নজরুল যেন একাকার হয়ে ওঠেন-

"ওঃ! কী আগুন-বৃষ্টি। আর কী তার ভয়ানক শব্দ। গুড়ুম-ক্রম্-দুম্। আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আশমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে। গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, এত ঘন যদি জল ঝরত আসমানের নীলচক্ষু বেয়ে, তাহলে এক দিনেই সারা দুনিয়া পানিতে ছয়লাপ হয়ে যেত।"[১২]

যুদ্ধের এই আগুন বৃষ্টি ধারার মুহূর্তটি কী অদ্ভুতভাবে সঙ্গতি এনে দেয় কবি নজরুলের এই কয়টি পঙক্তি-

"এ কী রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন-
ঝন রনরনরন ঝনঝন!
সে কী দমকি দমকি ধমকি ধমকি
দামা দ্রিমি দ্রিমি গমকি গমকি ওঠে চোটে, চোটে,

ছোটে লোটে ফোটে।
বহ্নি ফিনিক চমকি চমকি
ঢাল-তলোয়ার খনখন!"[১৩]

অন্যদিকে দেখা যায়, নায়ক সোহরাব যখন নায়িকা হেনাকে বলে, "হেনা, তোমায় বড্ড ভালোবাসি।" তখন হেনা তার কস্তুরীর মতো কালো পশমিনা অলকগোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললো ‘সোহরাব, আমি যে এখনো তোমায় ভালবাসতে পারিনি।‘ তারপরও সোহরাব যতই দেবদারুর ঝুমকো ফুল পেড়ে হেনার পায়ের কাছে ফেলে দিক না কেন, আর এতে মেহেদি ছোবানো হাতের চেয়েও যতই হেনার মুখ প্রেম-লাজে লাজ-রাঙা হয়ে উঠুক না কেন, একসময় স্তামুলি-সুরমা-মাখা তার কালো আঁখির পাতা ঝরে কিন্তু দু’ ফোঁটা অশ্রু গড়িয়েই পড়লো। আর নায়ককেও আমরা দেখি ব্যর্থতার বিষাদময়তা আড়াল করতে একটা কাঁচা মনক্কার থোকা ছিঁড়ে অদূরে কেয়া ঝোপের বুলবুলিটার দিকে ছুঁড়ে দিতে এবং গান বন্ধ করে বুলবুলিকেও উড়ে যেতে। - এখানে নায়ক সোহরাবের ব্যর্থ প্রেমের বিষণ্ণতা বুলবুলির গান বন্ধ করার অনুষঙ্গে যে ব্যঞ্জনা দান করেছে, তাই যেন কবি নজরুলেরই এই কয়টি পঙক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়-

"বুলবুলি নীরব নার্গিস-বনে/ঝরা বন গোলাপের বিলাপ শোনে।
শিরাজের নওরোজে ফাল্গুন মাসে/যেন তার প্রিয়ার সমাধির পাশে,
তরুণ ইরান-কবি কাঁদে নিরজনে।"[১৪]

‘হেনা’ গল্পে দেখা যায়, প্যারিস পার্শ্ববর্তী এক ঘন অরণ্যে মানবিকতার স্বপক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে জার্মানি সৈন্যের সঙ্গে গল্পের নায়ক হোস্রাবদের। যুদ্ধক্লান্ত সোহ্রাবকে আমরা দেখি সে বিশ্রামের খোঁজে বেছে নেয় ঐ যুদ্ধক্ষত বনেরই একটি নির্জন স্থানের প্রিয় অন্ধকারকে। এই অন্ধকারে বসে সৈনিক সোহরাবের আপাত কঠোর চিত্তলোক গহনে ভেসে আসে এই অনুভূতি-

"হায়। এই অন্ধকার এলে কত কথাই মনে পড়ে আমার আবার। ....আহা, গাছ থেকে ঐ দূরে বরফে ঢাকা নদীটা কী সুন্দর! আবার ঐ গোলার ঘায়ে ভাঙা মস্ত বাড়িগুলো কি বিশ্রী হাঁ করে আছে। এইসব ভাঙাগড়া দেখে আমার সেই ছোট্টবেলাকার কথা মনে পড়ে। তখন আমরা খুব ঘটা করে ধুলো বালির ঘর বানাতুম। তারপর খেলা শেষ হলে সেগুলোকে পা দিয়ে ভেঙে দিতুম, আর সমস্বরে গান গাইতুম-

হাতের সুখে বানালুম,
পায়ের সুখে ভাঙলুম।"[১৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ‘খোদার সৃষ্টি’ ধ্বংস করার খেলায় যে ভয়ঙ্কর মাতন সোহরাবের মধ্যে দিয়ে গল্পকার দেখলেন, তাকে তিনি মেলালেন নিজের বালির ঘর ভাঙার শৈশব- স্মৃতির সঙ্গে। যুদ্ধের বীভৎস পরিবেশেও একজন হাবিলদার সৈনিকের এহেন অনুভূতি সব্যসাচী নজরুলের কবি-আত্মাকেই স্মরণ করায়। ঘন অন্ধকারে বিশ্রামের অবকাশে সোহরাব আরো উপলব্ধি করে-

"মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিন চাঁদের জোছনা কেমন ছিটে ফোঁটা হয়ে পড়ছে সারা বনটার বুকে। এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতা বাঘের মতো দেখাচ্ছে।

কালো ভারী জমাট মেঘগুলো আমার মাথার দু'হাত ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে কোথায় ভেসে উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর তারই দু' এক ফোঁটা শীতল জল আমার মাথায় পড়ছে টপ-টপ-টপ্। কী করুণ শীতল সে জমাট মেঘের দু' ফোঁটা জল। আঃ।

চাঁদটা একবার ঢাকা পড়ছে, আবার সাঁ করে বেরিয়ে আর একটা মেঘে সেঁধিয়ে পড়ছে। এ যেন বাদশাহ জাদার শীশমহলের সুন্দরীদের সাথে লুকোচুরি খেলা। কে ছুটছে? চাঁদ না মেঘ? আমি বলব মেঘ, একটি সরল ছোট্ট শিশু বলবে চাঁদ, কার কথা সত্যি? আহা, কি সুন্দর আলোছায়া।"[১৬]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে বর্তমান থেকেও, সৈনিক সোহরাবের ঘন অন্ধকারে মিলন-বিরহের স্মৃতিচারণ, 'আহা, কী সুন্দর আলোছায়া'র কবিত্বময় উপলব্ধি গল্পকার নজরুলের কবি প্রকৃতিতে যেন একই সাযুজ্য সূত্রে গাঁথা পড়ে-

"আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ
শূন্যে গগনে আজো নিরাশায় আকাশে করি বিলাপ।
শত জনমের অপূর্ণ সাধ লয়ে-
(আমি) গগনে কাঁদি গো ভুবনের চাঁদ হয়ে,
জোছনা হইয়া ঝরে গো আমার অশ্রু-বিরহ তাপ।
কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে মোর তোমার স্মৃতির ছায়া,
এ জোছনা ঢাকিতে পারি না তোমার মধুর মায়া,
কোন সে সাগর মন্থন শেষে মোরে
জড়াইয়া যেন উঠেছিলে প্রেম ভরে,
(হায়) তুমি গেছ চলে, বুকে তবু দোলে তব অঙ্গের ছাপ।"[১৭]

মধুর মিলনের যে মায়া সাগর মন্থনের মতো স্মৃতি রোমন্থনে অমৃত সাধ জাগায়, কবির হৃদয়ে তার ভূমিকানুভূতি-'অশ্রু বিরহ তাপ'। 'হেনা' গল্পের প্রকৃতি বর্ণনাতে দেখা যায়, কালবৈশাখীর গাঢ় কালো ভয়ঙ্কর মেঘের মতো ধোঁয়া আকাশ অন্ধকার করলেও প্রাকৃতিক আকাশে কিন্তু সরল ছোট্ট শিশুর ভালো লাগার অনুভূতি নিয়ে ওঠে চাঁদও। কিন্তু মেঘ ও চাঁদের মধ্যিখানের ব্যবধান সোহরাবের কবিত্বময় ভাবনায় হয়েছে মিলন বিরহ ও আশা নিরাশার 'আলোছায়া'। কবি নজরুলের রোমান্টিক প্রেম কবিতার আলো অন্ধকার হাতড়ানো, ক্বচিৎ এক আধ ঝলক আলোর সন্ধান লাভ প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে গল্পকার নজরুলের এই 'আলোছায়া'র ভাব একাত্ম হয়ে ওঠে।

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর-প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন
আসছে নবীন-জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে-মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!"

সাধারণতঃ কবি প্রাণ যে সৌন্দর্য জগতের অভিসারী, নজরুলের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। বাংলা কবিতায় নজরুলের সৌন্দর্যাবলীর চিত্র ললিত মধুর। কিন্তু নজরুলের সৌন্দর্যাভিসার আন্তরিকতায় উষ্ণ স্পর্শ স্পন্দিত। আবার মানবিকতার পূজারী কবি নজরুল অমানবিক বৈষম্যের মধ্যে অসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সত্য-সুন্দর ও অসুন্দর অসততার সম্পর্কে নজরুলের কবি আত্মার এই স্বাতন্ত্র্যধর্ম তাঁর গল্পগুলির ভাববস্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রেও কাজ করেছে। যেমন-'রাক্ষুসী' গল্পটি।

নাটকীয় চমৎকারিত্বে আকর্ষণীয় 'রাক্ষুসী' গল্পের নায়িকা বিন্দী। স্বামী সোহাগিনী বিন্দী কোনমতেই স্বামীকে পরস্ত্রীর অধীন হতে দেবে না, এই সঙ্কল্প নিয়ে নিজ হাতেই হত্যা করে স্বামীকে। অবশ্য হত্যার পূর্বে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে স্বামীকে শোধরাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হয় ব্যর্থ। নিরুপায় হয়ে বিন্দী শেষে স্বামীকে নিজ হাতে খুন করার মানসিক প্রস্তুতিতে হয় দৃঢ়। এই খুনের দিনের সন্ধ্যায়, প্রকৃতির পরিবেশ বর্ণনায় গল্পকার আসন্ন হত্যার বাতাবরণটি চিত্রময়তায় ফুটিয়ে তুলেছেন-

"সে সাঁঝে একটু ঝিমঝিম্ বিষ্টির পরে মেঘটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। .... সাঁঝের সূর্যটার লাল আলো দা-টার উপর পড়ে চকচক্ করে উঠল। ঐ ঝাপসা রোদেই আবার বিষ্টি নেমে এল ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্। বাড়ির পাশে তখন একপাল ন্যাংটা ছেলে জলে ভিজতে ভিজতে গাইছিল-

রোদে রোদে বৃষ্টি হয়
খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়।"[১৮]

-নিজের স্বামীকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার মতো সতীর প্রচেষ্টা যেন এখানে মেঘ কেটে সাঁঝের সূর্যটার টক্টকে রক্তিমাভা বিকিরণের চিত্রকল্প সন্নিবেশে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, হত দরিদ্র মদ্যপ স্বামীর নিজের স্ত্রীকে (বিন্দীকে) ছেড়ে এক বহুবল্লভাকে বিয়ে করার ব্যভিচারী মানকিসতা, আশা-নিরাশার রোদ- বৃষ্টিতে যেন খেঁকশিয়ালের বিয়ের মতো অসংলগ্নতায় প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে যায়। নিজের হাতে স্বামীকে খুন করার মতো লৌকিক অপরাধ যেন সাঁঝের ঝিম্ঝিম্ বৃষ্টিতে ছেলেদের 'রোদে রোদে বিষ্টি হয়-খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়' এই আজগুবি ছড়ার মতোই অসঙ্গত ভাবের সাদৃশ্যবাহী হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে প্রকৃতির অনুষঙ্গে খুনের পরিবেশটি গল্পকার মিলিয়ে দিতে পেরেছেন যেন কবির অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে। যার সেখানে সত্য সুন্দর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গল্পকার নজরুলের কবি-আত্মাও বলে ওঠে যেন-

"মৃত্যুর হাতে মরে ত সবাই সেই শুধু বেঁচে থাকে
মানুষের লাগি যে চির বিবাগী, মানুষ মেরেছে যাকে।"[১৯]

প্রেমের সত্যসুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠায়, যে স্ত্রী নিজের অমানুষ স্বামীকে খুন করেছে এবং খুন করে আত্ম অনুশোচনায় জ্বলে শুদ্ধ হয়েছে, হয়েছে চির বিবাগিনী, সেখানে সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অসামাজিক অসত্য ও অমানবিক অসুন্দরের দ্বন্দু বিক্ষুব্ধতার কথা গল্পকার নজরুল সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন গল্পটিতে। আর এখানেই ধরা পড়ে কবি নজরুলের সত্য সুন্দর প্রতিষ্ঠার আবেগদীপ্ত আধুনিক ব্যঞ্জনা-

"প্রেম দিয়ে এক পূর্ণ পরম প্রেমময়ে পাওয়া যায়,
মজনু পায় না লায়লিরে, প্রেম দিয়ে হায় দুনিয়ায়।

প্রেম যে কি চায়, প্রেমিকও জানে না, বিশ্বে জানে না কেউ
ঢেউ এ মিশে ঢেউ শান্ত হয় না, কেন ওঠে আরো ঢেউ?
দেহ চায় দেহ, মন চায়, মন, আত্মা আত্মা চায়,
প্রেম তবু বলে কাঁদিয়া নিত্য কিছু পাইল না, হায়!
... ...
কে বলিতে পারে কেন অনুরাগ লোহিত সাগর তীরে
তৃষ্ণা-কাতর গোবি সাহারার মরুভূমি আছে ঘিরে।"[২০]

বিন্দির স্বামী প্রেমের বিশুদ্ধতা রক্ষার যৌক্তিকতা গল্পকার নজরুলের প্রেম সম্পর্কীয় বহুবিধ রহস্যময়তার সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে যেন একাত্ম করে তোলে উদ্ধৃত পঙক্তি দু'টি-

"কে বলিতে পারে কেন অনুরাগ লোহিত সাগর তীরে
তৃষ্ণা-কাতর গোবী সাহারার মরুভূমি আছে ঘিরে।"

-স্বামী প্রেমের তৃষ্ণায় কাতর বিন্দি যেন গোবী সাহারা। পত্নী-প্রেম বিমুখ ব্যভিচারী স্বামীর হৃদয় যেন লোহিত সাগর। বিন্দি সেই লোহিত সাগরকে হত্যারূপ মন্থনে মথিত করতে চায়। তারপর সেই মন্থনে উত্থিত জেলের হাজতবাসে প্রাপ্ত শাস্তিরূপ বিষ পান করে ধর্মপত্নীর আদর্শ রক্ষা করতে চায়। তার যুক্তি, স্বামীকে নরকগামী হবার আগেই খুন করে, সে নিজেই তো লোহিত সাগরকে পুণ্যবান করেছে। নিজেও হয়েছে পুণ্যবতী। নজরুল একটি চিঠিতে বলেন-

"আঘাত আর অপমান এ দু'টোর প্রভেদ বুঝবার মতো মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়তো আছে আমার। আঘাত করবার একটা সীমা আছে, যেটাকে অতিক্রম করলে আঘাত অসুন্দর হয়ে ওঠে-আর তখন তার নাম হয় অবমাননা। গুণীও বীণাকে আঘাত করেই বাজান, তাঁর অঙ্গুলির আঘাতে বীণার কান্না হয়ে ওঠে সুর। সেই বীণাকেই হয়তো আর একজন আঘাত করতে যেয়ে ফেলে ভেঙে।"[২১]

প্রেমাহত বিন্দির বিধ্বস্ত হৃদয় যেন ভগ্ন প্রেম-বীণা। লৌকিক দৃষ্টিতে বিন্দি তার সেই প্রেম-বীণাকে নিজের হাতে ভেঙে সেই বীণার তারে চিরন্তন প্রেমের সুরকেই যেন কান্নার সুর করে তুলেছে। আর কবির শাশ্বত মানবিকতার প্রেম-বীণার সমর্থনে, সেই ভাঙা বীণার কান্নাও হয়ে উঠেছে কল্যাণমন্ত্রের ওঙ্কার সুর। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ বিন্দি আত্মহননের আঘাতেই সেই কান্নাকে করে তুলেছে চিরন্তন প্রেম-বিরহের করুণ সন্ধ্যা পূরবীর সংবদ্ধ সঙ্গীতে। নজরুলের কবি-আত্মা প্রেমের এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেই বোধহয় বিন্দি চরিত্রকে স্বামী ঘাতিনীর মতো লৌকিক অপরাধে অপরাধী করেছে, কিন্তু পরক্ষণেই ঐ স্বামী ঘাতিনীর মুখ দিয়েই বলিয়েছে- "ভগবান আছেন। তিনি তো জানেন আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজের সোয়ামি দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ও পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি।"[২২]

এখানেই বিন্দি আধুনিক যুক্তিতে বীরাঙ্গনা, এক অর্থে সতীও। গল্পকার নজরুল সৃষ্ট বীরাঙ্গনা বিন্দির, এই রুদ্র সুন্দর বিদ্রোহী হৃদয়ে যেন বেজে ওঠে কবি নজরুলের এই অগ্নিবীণার সুর-

"টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু জ্বালা

উঠুক সরোষে উদ্ভাসী।"[২৩]

এই বিদ্রোহীরই সেই একই অগ্নিবীণায় বেজে ওঠে এই করুণ ব্যঞ্জনার সুরও-

"মৃত্যুর হাতে মরে ত সবাই সে-ই শুধু বেঁচে থাকে
মানুষের লাগি যে চিরবিবাগী, মানুষ মেরেছে যাকে॥"[২৪]

লক্ষ্যণীয়, এই সত্য-সুন্দর বিবাগীর কান্নাতেও শোনা যায় প্রেমের সত্য-সুন্দর মাধুর্যের সুর।

নজরুলের কবি-আত্মা কাব্যের প্রকরণ-নিগড়ে আবদ্ধ থেকে, প্রেমের এই বিচিত্র স্বভাব ধর্মের প্রকাশে হয়তো সীমাবদ্ধতা বোধ করেছিল। তাই গল্পের আঙ্গিকে বিন্দি চরিত্রের মাধ্যমে ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিক্রিয়া এনে, প্রেমের সেই স্বরূপ প্রকাশেই পেতে চেয়েছে তৃপ্তি। আধুনিক যুক্তির নিরীখে, প্রেমের এই রহস্যের মর্যাদা উন্মোচনের তাগিদেই, গল্পকার নজরুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবি নজরুলের কবি-আত্মার স্বভাব-ধর্ম। গল্পকার নজরুল তথা কবি নজরুলের যে চেতনা তাঁর শিল্প সৃজনমূলে ক্রিয়াশীল, তার অবিচ্ছন্নতা এরূপ অনিবার্যভাবে তাঁর গল্পে ও কবিতায় তর-তম রূপ পরিগ্রহ করেছে।

"তেমনই চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি,
লতা-নিকুঞ্জে কাঁদে আজও বন-বুলবুলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম॥
ঘুমায়ে পড়েছে সবে মোর ঘুম নাহি আসে
তুমি যে ঘুমায়েছিলে সেদিনও আমার পাশে
সাজানো সে গৃহ তব ঢেকেছে পথের ধূলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম॥
আমার চোখের জলে মুছে যায় পথ-রেখা
রোহিণী গিয়াছে চলি চাঁদ কাঁদে একা একা
কোন দূর তারালোকে কেমনে রয়েছ ভুলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম।"

'স্বামীহারা' গল্পের নায়িকা বেগম। একটি দুঃস্থ মুসলমান পরিবারের আদরের দুলালী সে। ভাগ্যক্রমে বিবাহসূত্রে এসে পড়লো সে সম্মানিত ও ঐশ্বর্যশালী পরিবারের বধূ হয়ে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে শেষ পর্যন্ত সে স্বামীহারা হয়ে অন্তহীন দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হ'ল। পতিভক্তিপরায়ণা এই রমণী স্বামীর কবরের পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, আর অব্যক্ত ক্রন্দনে তার একাকীত্বের বেদনা প্রকাশ করে স্বগতোক্তিতে। এই বর্ণনাতে গীতিকবিতার মতোই আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ-

'একটা মস্ত অসীম কাল আমার আঁখির পলকে যেন কোথা দিয়ে কোথা চলেছে, আর আমি কাকে পাবার কি পাবার জন্যে শুধু আকুলি বিকুলি মিনতি করে ডাকছি, কিন্তু কই, তিনি তো এলেন না-এতটুকু সাড়াও দিলেন না। তবে দুপুর রোদ্দুরে ঘুনঘুন মাছির ঐ যে খুব মিহি করুণ গুনগুন্ সুর শুনি এই গোরস্থানে, ও কি তাঁরই কান্না?

"দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে

এবার তবে গভীর করে ফেলগো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে।"[২৫]

বিশ্বপ্রকৃতি লোকের নানা উপকরণের সঙ্গে প্রেমানুভূতির এমন একাত্ম হয়ে ওঠা নজরুলের কবিতায় সার্থকরূপে দেখা গেছে-

"গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন আমারে ডাকে
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
কাহার ক্ষুধিত প্রেম যেন হায় ভিক্ষা চাহিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়
কার সকরুণ আঁখি দুটি যেন রাতের তারার মত
মুখপানে চেয়ে থাকে- সে কি তুমি, সে কি তুমি?
নিশির বাতাস কাহার হুতাশ দীরঘ নিঃশ্বাস সম
ঝড় তোলে এসে অন্তরে মোর; ওগো দুরন্ত মম।
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
মহাসাগরের ঢেউ এর মতন
বুকে বাজে এসে কাহার রোদন?
পিয়া-পিয়া নাম ডাকে অবিরাম
বনের পাপিয়া পাখি
আমার চম্পা-শাখে
সে কি তুমি, সে কি তুমি?"[২৬]

-মহাসাগরের ঢেউ-এর মতো স্বামীহারা নিঃসঙ্গিনী বেগমের বিরহ-ব্যথা পাপিয়ার পিয়া পিয়া উদাস ডাকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। গল্পকার নজরুলের কবি-আত্মা এই বিরহের উদাস ডাকে হয়ে ওঠে বিষাদ বিধুর-

"গোরস্থানে সমস্ত শিরীষ, শেফালি আর নীল ভুঁই কদমের গাছগুলিকে আর্দ্র করে ঐ যে সন্ধে হতে সকাল পর্যন্ত শিশির ক্ষরে, ও কি তাঁরই গলিত বেদনা? বিজুলির চমকে ঐ যে তীব্র আলোকচ্ছটা চোখ ঝলসিয়ে দেয়, ও কি তাঁরই বিচ্ছেদ-উন্মাদ হাসি? সৌদামিনীর স্ফুরণের একটু পরেই ঐ যে মেঘের গম্ভীর গুরু গুরু ডাক শুনতে পাই, ও কি তাঁর পাষাণ বক্ষের স্পন্দন? প্রবল ঝঞ্ঝার মতো এসে সময় সময় ঐ যে দমকা বাতাস আমাকে ঘিরে তাণ্ডবনৃত্য করতে থাকে, ও কি তাঁরই অশরীরী আত্মার ব্যাকুল আলিঙ্গন? গোরস্থানের পাশ দিয়ে ঐ যে কুনুর নদী বয়ে যাচ্ছে, আর তার চরের প্রস্ফুটিত শুভ্র কাশফুলের বনে বনে দোলদোলা দিয়ে ঘন বাতাস শনশন্ করে ডেকে যাচ্ছে, ও কি তাঁরই কম্পিত কণ্ঠের আহ্বান? আমি কেন ওঁরই মতো অমনি অসীম, অমনি বিরাট ব্যাপ্ত হয়ে ওঁকে পাই না? এ সীমার মাঝে অসীমের সুর বেজে উঠবে সে আর কখন? এখন যে দিন শেষ হয়ে এলো।"[২৭]

প্রেম-বিরহিনী বেগমের অন্তর স্বামীর সমাধিক্ষেত্রের এইরূপ শূন্যতার প্রেক্ষাপটে গল্পকার নজরুলেরই কবি-আত্মা যেন বলে ওঠে-

"ওর নিশীথ সমাধি ভাঙিও না।

মরা ফুলের সাথে ঝরিল যে ধূলি পথে,
সে আর জাগিবে না, তারে ডাকিও না।
তাপসিনী সম তোমারি ধ্যানে
সে চেয়েছিল তব পথ পানে,
জীবনে যাহার মুছিলে না আঁখি ধার
আজি তাহার পাশে কাঁদিও না।
মরণের কোলে সে গভীর শান্তিতে/পড়েছে ঘুমায়ে।
তোমারি তরে গাঁথা শুকনো মালিকা বক্ষে জড়ায়ে।
যে মরিয়া জুড়ায়েছে/ঘুমাইতে দাও তারে জাগিও না।"[২৮]

-'সীমার মাঝে অসীমের সুর' হয়ে যে প্রেমিক স্বামী আজ সমাধিতে চির নিদ্রাভিভূত, সেই অনন্ত প্রেমের আশ্রয়কে তো আর শুধু মিলন মধুর মর্ত্য-প্রেমের চোখের জলে ফিরিয়ে আনা যায় না।

সুতরাং, সেই অনন্ত প্রেমিক পুরুষকে, প্রেমিকার চোখের জলে বিব্রত না করে, তার স্মৃতি ধ্যানেই তাকে শান্তি দেওয়া হোক, এই-ই যেন কবির ইচ্ছে। আবার, তার প্রেম-স্মৃতি ধ্যানই প্রেমিকা বেগমের ভাবী জীবনের পথ চলার পাথেয় হোক, নজরুলের চির-বিরহী কবি আত্মার এই শাশ্বত অভীপ্সাই যেন গল্পকার নজরুলের মধ্যে এখানে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রেম-বিরহের আবেগঘন রোমান্টিক প্রকাশ বৈষ্ণব পদাবলী থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনেক কবিরাই করেছেন। এমনকি আধুনিক ছোটগল্পেও এই প্রকৃতি অনুষঙ্গের ব্যাপারটি ব্যঞ্জনাময় করে তুলে কবি-গল্পকাররা সুন্দর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক লীলায় দাঁড়িয়ে, হাবিলদার কবি নজরুল বাহ্য প্রকৃতির চেতনাকে ছোটগল্পের ভাববস্তু প্রকাশের আনুকূল্যে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। আসলে, সৈনিক গল্পকার নজরুলের অন্তরে বিরহ-মাধুর্য উপলব্ধি করার মতো যে স্নিগ্ধ রোমান্টিক কবি মনটি ছিল, তার অভাবেই প্রকৃতি চিত্রণের মধ্যে তাঁর গল্পগুলিও পেয়ে গেল প্রায় গদ্য-কাব্যের রূপ। পেল 'আর এক কালের', 'আর এক জগতের' স্বাদ। বিশেষ করে 'ব্যথার দান' গল্প গ্রন্থের প্রায় গল্পেই মৃত্যুর মসী গল্পগুলির প্রেমের স্মৃতি-ব্যথাকে করে তুলেছে বিষাদঘন। নিসর্গমায়ার রহস্যকঠিন অভিব্যঞ্জনা তাকে ভাবগ্রাহী রূপ দিয়েছে, সন্দেহ নেই।

বাংলার মজ্জাগত রোমান্টিসিজমের প্রভাবকে নজরুল এড়িয়ে চলতে পারেননি। বাংলার মাটির এমনই গুণ যে, এখানে ওজোগুণ সম্পন্ন কবিতা রচনাকালেও প্রায়শই দেখা যায় কোনো না কোনো মুহূর্তে কবি আবেগোচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে ওঠেন। নজরুলের কবিতা ও গানের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে অগ্নিস্রাবী হলেও প্রেম-বিরহের কবিতাতে তাঁর ভাষা অশ্রুসিক্ত। তাঁর হৃদয় প্রকৃতির বেদনার সঙ্গে বাংলাদেশের সকরুণ ও সংবেদী প্রকৃতি যেন একাত্ম হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর কাব্য-চরিত্রের এই দুটি দিক পরস্পর বিরোধী সত্তা নয়,-একটি মৌল প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল। কারণ, যে স্পর্শ-চঞ্চলতা ও ভাবালুতা তাঁকে বিপ্লবী করেছিল, সেই প্রাণময়তাই তাঁকে প্রেমিক ও হৃদয়ধর্মী করেছে। আর তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের বিরহ-আদর্শটি প্রকৃতির অনুষঙ্গে তাঁর গল্পকেও করে তুলেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় হৃদয়বেদ্য। 'ব্যথার দান', 'হেনা' গল্পে তাই যুদ্ধের রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব এবং 'স্বামীহারা' গল্পের শ্মশান প্রকৃতির প্রভাব কবিকে বিরহের, কোমল

অনুভূতির মধ্যে পৌঁছে দিয়েছে-পৌঁছে দিয়েছে প্রকৃতির রহস্যভেদী কবির কাছাকাছি। এখানেই নজরুলের কবি-প্রকৃতির আর গল্পকারের শিল্পী-স্বভাবের সহাবস্থান একই চেতনায় স্থান করে নিয়েছে।

পর্বাঙ্গ-খ

প্রকৃতি ও প্রেমানুভব:

"ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি / ক্ষমিও সে অপরাধ।
অসহায় মনে কেন জেগেছিল / ভালোবাসিবার সাধ॥
কত জন আসে তব ফুলবন / মলয়, ভ্রমর, তাঁদের কিরণ,
তেমনি আমিও আসি অকারণ / অপরূপ উন্মাদ।॥
তোমার হৃদয়-শূন্যে জ্বলিছে/ কত রবি শশী তারা
তারি মাঝে আমি ধূমকেতু-সম / এসেছিনু পথহারা,
তবু জানি প্রিয়, একদা নিশীথে / মনে পড়ে যাবে আমারে চকিতে
সহসা জাগিবে উৎসব গীতে / সকরুণ অবসাদ।"

নজরুল আবেগ প্রধান হৃদয় নির্ভর রোমান্টিক কবি। স্বভাবতই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় আন্তরিক সম্পর্ক। কাব্যের মতো গল্পেও নজরুলের প্রকৃতি প্রীতি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সুখ-দুঃখ ও মিলন বিরহের মালা গেঁথেছে। গল্পগুলির স্থায়ীভাব প্রেম। আর সেই প্রেমের দুরাগত ভাব মিলন নয়-বিরহ। বিরহের আর্তিকেই নজরুল তাঁর সুদূর স্মৃতিতে পূরবীর উদাস সুরে করে তুলেছেন বেদনা-বিধূর। প্রেমিকার ব্যাকুল সন্ধানে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ অনেক ক্ষেত্রেই মুন্সিয়ানার সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কামনাকে শেষ পর্যন্ত লেখক ইন্দ্রিয়োর্ধ্ব সমর্পণে পরিণতি দিয়েছেন।

নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার অন্তরালে রয়েছে তাঁর চির বিরহী প্রেমিক সত্তা। প্রিয়া বিরহে তাঁর বেদনা ক্ষরিত হয় নীরবে, নিভৃতে। প্রেমের সনাতন শাশ্বত বিরহের ঐতিহ্যই তাঁর হৃদয় বীণায় বাজিয়ে তোলে সন্ধ্যা পূরবীর উদাস সুর। সেখানে দীপক রাগিনীর সংরাগ সম্ভোগাক্ত প্রেমের সংস্পর্শ পায় ভিন্ন মাত্রা। তাঁর আন্তর-প্রকৃতির এই প্রেম-বিরহের রাগ-সংরাগে, বাহ্য প্রকৃতি বর্ণনাও রোমান্টিক কবির অশ্রু-নিষিক্ত শুচিতার স্পর্শে সংবেদ্যতা লাভ করে। নজরুলের অসংখ্য গানে এবং 'দোলনচাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক', 'ছায়ানট'-প্রভৃতি কাব্যে এই কবিত্ব লক্ষণ সততই বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ 'অভিশাপ' কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে-

"... ... ...

ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি,
সাগর আকাশ বাতাস চিরি
যেদিন আমায় খুঁজবে বুঝবে সেদিন বুঝবে।

... ...

বাসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির ছেঁচা রাত্রি,

থাকবে সবাই-থাকবে না এই মরণ পথের যাত্রীই
আসবে শিশির রাত্রি।
… … … … … …
ফুটবে আবার দোলন চাঁপা চৈতি রাতের চাঁদনী
আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজবে আমার কাঁদনী
চৈতি রাতের চাঁদনী।" [২৯]

প্রিয়ার সঙ্গে ছিল একদিন মিলনের সুখ। আজ নেই। আছে সুখ মুহূর্তগুলোর স্মৃতি-হর্ষ এবং বিচ্ছেদ-ব্যথা। নজরুল এই বৈপরীত্যে যুক্ত অনুভূতিকে প্রাকৃতিক চিত্রে মিশিয়ে তাঁর কবি মনের অনুভূতির বিমিশ্রতায় প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'সাগর আকাশ বাতাস চিরি/যেদিন আমায় খুঁজবে' -'চিরি' শব্দটি এখানে, যেন বেদনার্ত হৃদয় খুঁড়ে ফেরে। 'কণ্ঠে তোমার কাঁদবে বেহাগ'-'বেহাগ' শব্দটিতে কল্পনা সৌন্দর্যকে কবি ধরে রেখেছেন চারু বক্রতায়। 'গাঁথবে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কন', -স্মৃতির আবেগে চঞ্চল হলো হাতের কঙ্কন। এখানে 'কঙ্কন' শব্দে কবি সুন্দর ধ্বনিচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার প্রত্যক্ষ রূপধৃত বেদনাকে কবি ভাবানুষঙ্গ দান করেছেন- 'কবর ঢেকেছে সাদা শেফালিতে।' এইরূপ প্রশান্ত কোমল মৃত্যু-বেদনাকে নজরুল বিরহ ব্যথার ভাবসাদৃশ্যে লালিত্যমাখা কাব্য সুরভি প্রদান করেন তাঁর 'মেহের নেগার', 'শিউলিমালা' ও 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' গল্পতেও। 'শিশির ছেঁচা রাত্রি'-এখানে শিশির পাতের শব্দের মৃদুতায় রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ নয়, এখানে প্রতিটি শিশির পাতের শব্দে হৃদয় যেন বেদনায় নিষ্পিষ্ট হয়েছে। 'কাঁটা হয়ে ফুটবে' কাঁটা বা বিষ নজরুলের ঘরোয়া প্রেম-বিচ্ছেদের কবিতাতে এক ধরনের সংরাগ তীক্ষ্ণতার স্পর্শ আনে যা নজরুলের প্রেম কবিতায় প্রায়ই ব্যবহৃত। 'আমার মত চোখ ভরে চায় যে তারা'-তারার উপমা এখানে প্রণয় দৃষ্টির গভীরতা ও প্রসারতাকে নিখিলের ব্যাপ্তি দিয়েছে।

এই কবিতায় প্রাকৃতিক অনুষঙ্গগুলি চিনিয়ে দেয় উদ্দিষ্ট কবিকে। আর এই নজরুলেরই গল্প পড়তে আমরা খুঁজে পাই কবি নজরুলকেও। যেমন 'ঘুমের ঘোরে' গল্পে গল্পকার নজরুলের মানস-প্রিয়া ঘুমের দেশের রাজকন্যা। এই রাজকন্যার প্রেমিকের সুখ-স্মৃতি অনুভূতির বর্ণনায়, গল্পের পাতায় কবি নজরুলেরই কণ্ঠ যেন শোনা যায়-

'সে ছিল এমনি এক চাঁদনী-চর্চিত যামিনী , যাতে আপনি দয়িতের কথা মনে হয়ে মর্মতলে দরদের সৃষ্টি করে। মদির খুশুর মাদকতায় মল্লিকা মালতীর মঞ্জুর মঞ্জরীমালা মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল। উগ্র রজনীগন্ধার উদাস সুবাস অব্যক্ত অজানা একটা শোক-শঙ্কায় বক্ষ ভরে তুলেছিল।

সে এলো মঞ্জরী-মুখর চরণে সেই মুকুলিত বিতানে। তার বাম করে ছিল চয়িত ফুলের ঝাঁপি। কবরী ভ্রষ্ট আমের মঞ্জরী শিথিল হয়ে তারই বুকে ঝরে পড়েছিল, ঠিক পুষ্প-পাপড়ি বেয়ে পরিমল ঝরার মতো। কপোল চুম্বিত তার চূর্ণকুন্তল হতে বিক্ষিপ্ত কেশর রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোশ-খবর চারিদিকে রটিয়ে এলো, ওগো ওঠ, দেখ ঘুমের দেশ পেরিয়ে স্বপ্ন বধূ এসেছে। উল্লাস হিল্লোলে শাখায় শাখায় ঘুমন্ত ফুল দোল খেয়ে উঠল। আমার কপাল ঘামে ভরে উঠল। বক্ষ দুরু দুরু করে কাঁপিয়ে গেল সে কোন বিবশ শঙ্কা। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে আমার হাতের কামিনী-গুচ্ছটির দলগুলি খসে খসে পড়তে লাগল। আমার বোধ হ'ল, এ কোন ঘুমের দেশের রাজকন্যা আমার কিশোরী মানস-প্রতিমার পূর্ণ পরিণতির

রূপ এসে আমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমার আবিষ্ট চোখের পাতা তুলেই দেখতে পেলুম, বেতস লতার মতো সে আমার সামনে অবনত মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে যেন সে চলে যেতে চাইলে। আমি তাড়াতাড়ি ভীত-জড়িত স্বরে বললুম,-'কে তুমি?' তার আয়ত আঁখির এক অনিমিখ চাউনি দিয়ে আমার পানে দেখেই সে থমকে দাঁড়াল। শুক্ল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার দুটি বড় বড় চোখে চোখ ভরা জল। ...এক পলকে পরীর নুপুরের রুনু ঝুনু শিঞ্জিনি চমকে যেন কি বলে উঠল। আনন্দ ছন্দের হিন্দোলার দোল আর দুলল না। অপসৃত আর লুণ্ঠিত চঞ্চল অঞ্চল অসমৃত হ'ল। শিথিল বসনার ফুল্ল কপোল লাজশোনিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িম্বের মতো হিঙ্গুল হয়ে ফুটল। সমীরের থামার সাথে সাথে যেন উল্লসিত-সরসী সলিলের কল-কল্লোল নিথর হয়ে থামল, আর তারই বুকে একরাশ পাতার কোলে দুটি রক্ত-পদ্ম ফুটে উঠল।"৩০

এই দুটি রক্ত-পদ্ম যেন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রণয়ভীরু দুই প্রেমিক- প্রেমিকা। এই দুই হৃদয়ের লাজনম্র প্রকাশ ভীরুতাকে গভীর অনুভবের রূপে ফোটাতে, গল্পকার তাঁর কবি-হৃদয়ের উপমা বৈচিত্র্যকেই দুই লাল পদ্মফুলের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন।

প্রেমে বঞ্চিত হবার ব্যথায় চোখ জলে ভরে আসে ঠিকই, কিন্তু সেই চোখের জলের সাথে বেদনাহত হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ফেনিয়ে ওঠে ক্লান্তিভরা স্নিগ্ধতা। ঐকান্তিক প্রেমের পবিত্রতা বজায় রাখতে পারার স্নিগ্ধতা। ঘুমের ঘোর কাটলে আজহার উপলব্ধি করে, তার দুই গণ্ডদেশ বয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। সেই অশ্রু স্বপ্নরানীকে হারাবার বেদনাশ্রু। কিন্তু বাস্তবের কঠিন সত্যে দাঁড়িয়ে সে আবার তার অন্তরের প্রেমাদর্শকে সজাগ করে। পৌরুষদীপ্ত সে। এই শুদ্ধ প্রেমিক তাই প্রেমের বিরহ-স্মৃতিকেই হৃদয়ে বহন করে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায়। অবশ্য এই পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বও কঠোর আদর্শে দীপ্তিমান হতে পারে না, শ্রান্ত বিরহী কবির হৃদয়ের আশ্রয়স্থল যেন ব্যথাদীর্ণ অশ্রুতে ভরে ওঠে শুধু-

"আর অনুনয় করিবে না কেউ কথা কহিবার তরে
আর দেখিবে না স্বপন রাতে গো কেহ কাঁদে হাত ধরে
তবু সুখ ঘিরে আর মোর দু'নয়ন
ভ্রমরের মত করিবে না জ্বালাতন
তব পথ আর পিছল হবে না আমার অশ্রু ঝরে।
তোমার ভুবনে পড়িবে না আর কোনদিন ছায়া মম
তোমার পূর্ণ চাঁদের তিথিতে আসিবে না রাহু সম।
আর শুনিবে না করুণ কাতর
এই ক্ষুধাতুর ভিখারীর স্বর,
আর শুনিবে না কাহার রোদন / রাতের আকাশ ভরে।"[৩১]

-কল্পনার ঘুমের ঘোর কাটলে আজহার উপলব্ধি করে এই কঠিন সত্য যে, বিরহই শাশ্বত সত্য। যে কবি প্রেম-বিরহের ব্যথাকেই বরণ করে নিয়েছেন হাসিমুখে, তাঁর আর প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় রাহুরও আসার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু বিরহ-ব্যথা, প্রেম-বিরহের স্মৃতি গৌরব। এই ভাবাদর্শটিই 'ঘুমের ঘোরে' গল্পটিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছে। বিরহ মাধুর্যের গর্বে গরবী হয়ে কবি ও গল্পকার নজরুল, গল্পটিতে যে শান্তির মত স্নিগ্ধ পবিত্রতা ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে গল্পটি হয়ে উঠেছে গীতিকাব্যের মতোই প্রাণস্পর্শী।

প্রকৃতি চেতনার রোমান্টিক প্রয়োগে আর কাব্যধর্মী ভাষায়, গল্পের রোমান্টিক প্রণয় কাহিনীকে গল্পকার পুষ্পিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য গল্পের প্লটের বাঁধন তাতে শিথিল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গীতিকাব্যোচিত চিত্রধর্মী প্রতীকী সৌকর্য সেই ত্রুটিকে অনেকটাই যেন আড়াল করে। ইন্দ্রিয়ঘনতার পরিবর্তে প্রেম এখানে বেশি মাত্রায় রোমান্টিক। রাত্রির মায়া কবির মানসীকে যে প্রণয়াবেগে ঘিরে রেখেছে তার রং কুমকুম রক্তিম। এখানেই গল্পটির ভাবরস। নজরুলের কবি-আত্মার নিবিড় স্নিগ্ধতা ও প্রেমের লাবণ্যে এই ভাবরসই হয়ে ওঠে কবি ও গল্পকারের সমচৈতন্য সুরভিত।

'মেহের নেগার' গল্পের নায়ক য়ুসোফ প্রেমে পড়ে গুলশনের। গুলশন রূপোপ- জীবিনীর মেয়ে, সে য়ুসোফের মাধ্যমেই প্রথম অকৃত্রিম প্রেমকে করেছে আস্বাদন। এ জীবনে পরস্পর মিলিত হতে না পারলেও গুলশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে যে, পরবর্তী জীবনে তাদের মিলন হবেই। সমালোচক বলেন-

"গল্পটিতে প্রেমের মাহাত্ম্যই সূচিত হয়েছে। দেখানো হয়েছে প্রকৃত প্রেম কত মহান, কত অনায়াসে তা অন্তহীন বিচ্ছেদ-বেদনাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে পারে। অকৃত্রিম প্রেম হল চিরন্তন।"৩২

য়ুসোফের জীবনে চিরন্তন প্রেমের এই মাধুর্য উপলব্ধি আসে কামনার হাত ধরে। মুসোফের কবি মন রোমান্টিক স্বপ্নঘোরে কুয়াশাচ্ছন্ন। স্বপ্নঘোরে তার মানসপ্রিয়া স্বপ্নরাণীর উপস্থিতি, তার কামনাকে কবির স্বতোৎসারিত আবেগে সঞ্জীবিত করে-

'শীঘ্রই আমার চেতনা লুপ্ত করে দিলে সে যেন কার শিউরে ওঠা কোমল অধরের উন্মাদনা-ভরা চুম্বন বুলিয়ে দিলে। দেখলুম, সেখানে আসমান আর দরিয়া চুমোচুমি করছে, সেইখানে একটি কিশোরী বীণা বাজাচ্ছে, বরফের ওপর চাঁদের চাঁদনী পড়লে যেমন সুন্দর দেখায় তাকে তেমনি দেখাচ্ছিল। সূক্ষ্ম রেশমী নীল পেশোয়াজের শাসন টুটে বীণা বাদিনীর কৈশোর মাধুর্য ফুটে বেরুচ্ছিল-আসমানের গোলাপী নীলিমায় জড়িয়ে প্রভাত অরুণশ্রীর মতো মহিমশ্রী হয়ে। সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে, আমার চোখে ঘুমের রঙিন কুয়াশা মসলিনের মতো একটা ফিনফিনে পর্দা টেনে দিলে। বীণার চেয়ে মধুর বীণাবাদিনীর মঞ্জুগুঞ্জন প্রেয়সীর কানে কানে কওয়া গোপন কথার মতো আমায় কয়ে গেল ঐ যে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে দরিয়ার কিনারে ঐখানে আমার ঘর। ঐখানে আমি বীণা বাজাই। তোমার ঐ সরল বীণার সহজ সুর আমার বুকে বেদনার মতো বেজেছে, তাই এসেছি। আবার আমাদের দেখা হবে সূর্যাস্তের বিদায় স্নাত শেষ আলোক তলে। আর মিল হবে এই উদার আকাশের কোলে এমনি এক অরুণ-অরুণিমারক্ত নিশি ভোরে, যখন বিদায় বাঁশির ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ঝরে পড়বে। আমি আবিষ্টের মতো আঁচল ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, কে তুমি স্বপ্নরাণী? সে বললে, আমায় চিনতে পারলে না য়ুসোফ? আমি তোমারই মেহের নেগার।

এই মেহের নেগারের কামনাসক্ত প্রেমের আকর্ষণেই যুসোফ তাকে পেতে চাইলো। মেহের নেগারকে সে স্পষ্ট জানায়,-'তুমি আমারই'। কিন্তু তারপরই সে গুলশন জানায় যে সে রূপোপজীবিনীর মেয়ে, ঘৃণ্য। তার ভাবলোক যেন বলে ওঠে-

"বিকাল বেলার ভূঁইচাঁপা গো সকাল বেলার যুঁই
কারে কোথায় দেব আসন তাই ভাবি নিতুই।।
ফুলদানিতে রাখব কারে/কারে গাঁথি কণ্ঠহারে

কারে দেব দেবতারে কারে বুকে থুই।।
সমান অভিমানী ওরা সমান সুকোমল
চাঁপা আমার চোখের আলো/ঘুঁই চোখের জল।
বর্ষামুখর শ্রাবণ-প্রাতে/কাঁদি আমি যুঁথির সাথে
চাঁপায় চাহি চৈতি রাতে প্রিয় আমার দুই॥"[৩৪]

তাই য়ুসোফের দরবেশের সমান অকৃত্রিম ভালবাসাকে সে কামনার আগুনে পুড়িয়ে কালিমালিপ্ত করতে চায় না। সে চায় য়ুসোফের জীবন থেকে সরে গিয়ে তার ভালবাসাকে পবিত্র ও চিরন্তন করে রাখতে। তাই য়ুসোফকে তার পাবার আশা ত্যাগ করতে হবে। তাতেই হবে চিরন্তন প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও চরিতার্থতা। য়ুসোফের হৃদয়ে যেন জগদ্দল পাষাণ ভেঙে পড়লো। তার অনুভূতি এখন- 'চাঁদের সমস্ত আলো এক লহমায় নিভে গেল বিরাট একটা জলো মেঘের কালো ছায়ার আড়ালে পড়ে।' [৩৫]

কামনার রাণীকে পাবার আশা যেন মুসোফের জীবনের সমস্ত আলো। তাকে হারাবার ব্যথা যেন জলো মেঘের কালো ছায়ার আড়াল। এ যেন 'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা'। এই পৌষ-ফাগুনের পালা কিংবা দিনের আলো ও মেঘের কালোর ছায়ান্ধকার নিয়েই গল্পকার নজরুল যেন গীতিকবির সমরূপে সম্ভাবনায় ধরা দিয়েছেন। নিম্নোদ্ধৃত পঙ্ক্তি কয়টি যেন তারই সাক্ষ্য দেয়-
"মেঘে ডুবাও সহস্র দল রবি কমল দীপ। ফুটাও আঁধার কদম ঘুম শাখে মোর স্বপন মণি-নীপ। নিখিল-গহন-তিমির তমাল গাছে কালো কালার উজল নয়ন নাচে, আলো রাধা যে কালোতে নিত্য মরণ যাচে ওগো আনো আমার সেই যমুনার জল-বিজলির আলো। তিমির প্রদীপ জ্বালো।"

য়ুসোফের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে, মেহের নেগার নিরাশার অন্ধকারে যুসোফের চিত্তকে বিষাদক্লিষ্ট করে তুলেছিল। অথচ সেই কল্পনারী মেহের নেগারের মধ্যে দিয়েই য়ুসোফ দেখেছে বাস্তব নারী গুলশনকে। আবার এই গুলশনরূপী মেহের নেগারই য়ুসোফকে দেখিয়েছে প্রেমের শাশ্বত মাধুর্যের রূপ। এই ভালবাসার স্বরূপ উদ্ভাবনে গল্পকার নজরুলের কবি আত্মাও সদা তৃষাতুর-

"দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির মাগি,
সেথায় আঁধার বাসর ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি।
ম্লান করে দেয় আলোর দহন জ্বালা,
তোমার হাতের চাঁচ-প্রদীপের থালা,
শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গহন-ডালা
ওগো অসিত আমার নিশীথ-নিতল শীতের কালোই ভালো।
তিমির প্রদীপ জ্বালো।"[৩৭]

বিরহের এই 'তিমির প্রদীপ' জ্বেলেই 'মেহের নেগার' গল্পের নায়ককে তার কামনাসক্ত প্রেমের মোহান্ধতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন গল্পকার। নায়ক মুসোফের ভোগাসক্তিপূর্ণ ঐহিক প্রেমের জ্যোতির্গেহে, অনন্ত প্রেমবিরহের তিমির প্রদীপ জ্বেলেই নজরুল তাকে মুক্তি দেয় তার কামনাসক্ত প্রেমের জ্বালা থেকে। 'এই অতল কালো'র (ঐহিক প্রেমের কামনাসক্ত জ্বালার) ওপর 'তিমির প্রদীপ' (শাশ্বত বিরহের মাধুর্য প্রদীপ) জ্বালানোর মধ্য দিয়েই বিরহী কবি নজরুলের শিল্পী-আত্মার সঙ্গে গল্পকার নজরুলের শিল্পী আত্মা একই চেতনায় সঞ্জীবিত।

আকাঙ্ক্ষিত বা অভীষ্ট বস্তু নয়, কিন্তু তার সঙ্গে পরোক্ষ কোনরকম সম্পর্ক বা মিল আছে-এমন বাস্তবকেই আমরা চিহ্নিত করি প্রতীক নামে। এই প্রতীকী ব্যঞ্জনাতেই শিল্পীর ব্যক্তি আত্মার ভাব ও ভাবনার স্বভাব সৌন্দর্যের স্বরূপ আভাসিত হয়। প্রেমের মন্দিরে গুলশনের প্রেম আসে ভোগাসক্তিপূর্ণ ঐহিক প্রেম হয়ে। এই প্রেমে জৌলস আছে, কিন্তু কবির অন্তরের সৌন্দর্য অভিষেকে তা চরিতার্থ হয় না। তাইতো মুসোফের প্রেম-বিরহের মাধুর্য উপলব্ধিকে গল্পকার নজরুল যেমন প্রকৃতিলোকের দর্পণে প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি তাঁর কবি আত্মায় সেই উপলব্ধি প্রকৃতির জগৎকে কেন্দ্র করে প্রতীকায়িত হয়ে যায়-

"নয়ন আমার তামস তন্দ্রালসে
ঢুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে,
রৌদ্রে কুহুর দীপক-পাখা পড়ুক টুটুক খসে
আমার নিদাঘ দাহে অমা মেঘের নীল অমিয়া ঢালো।
তিমির প্রদীপ জ্বালো।"[৩৮]

'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পে, সৈনিক গল্পকারের কাছে তাঁরই সহযোদ্ধা এক যুবকের আত্মজীবনী-কাহিনীকে গল্পাঙ্গিকে ঠাঁই দিয়েছেন গল্পকার। এই প্রেম-বিরহের বিষাদঘন আত্মকাহিনী বর্ণনায় চমৎকারিত্ব আছে। দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধ বর্ণনা-মাধুর্য কবি নজরুলকেই যেন স্মরণ করায়। প্রথমা পত্নী রাবেয়ার মৃত্যুর পর কবরে লুটিয়ে পড়েছে গল্পের কথক নায়ক। তার অনুভূতি ধরা পড়েছে তারই কথায়-

"আমার চারিদিকে একটা ঘূর্ণিবায়ু হু হু করে কেঁদে ফিরতে লাগল, ছোট্ট শিউলি গাছ থেকে শিশিরসিক্ত ফুলগুলো আমার মাথায় ঝরে পড়তে লাগল। ও আমার রাবেয়ার অশ্রুবিন্দু, না কারুর সান্ত্বনা।"[৩৯]

প্রাণপ্রিয়া প্রেয়সীর আকস্মিক মৃত্যুতে গল্প-কথক যুবকের এই উক্তি, যৌবনোদ্দীপ্ত প্রেম-ভিখারী কবি নজরুলকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়-

"ঝরার আগে যে কুসুমে দেখেও দেখি নাই
ও যে বৃথাই হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল ছোট্ট বুকের একটু সুরভি,
আজ তারি সেই শুনো কাঁটা বিঁধছে বুকে ভাই
আহা সেই সুরভি আকাশ কাঁদায় / ব্যথায় যেন সাঁঝের পূরবী।"[৪০]

যে প্রেম-কুসুম ঝরার সময় হয়নি, এখনো প্রেমের সৌরভ ছড়ানোর মতো মাধুর্য ছিল আরো, সেই প্রেম-কুসুম বৃথাই বিরহের শূন্য হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল, অকালে ঝরে গেল নিভৃতে। হৃদয়ে রেখে গেল-সন্ধ্যা পূরবীর উদাস বিরহ-ব্যথা। এই প্রতীকী ব্যঞ্জনাতেই 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', গল্পটির নায়কের অর্থাৎ কথক যুবকটির বিরহী হৃদয়ের সঙ্গে গল্পকার নজরুলের অতৃপ্ত প্রেম পিয়াসী কবি আত্মার অদ্বৈতত্ব পাঠকের উপলব্ধিতে ধরা দেয়।

'অতৃপ্ত কামনা' গল্পে গল্পকার নজরুল উত্তম পুরুষের জবানীতে প্রকাশ করেছেন তাঁর বাল্যপ্রেমের স্মৃতি। এই প্রেমের স্মৃতিতে বিরহের যে অতলান্ত ব্যথার গাঢ়তা রয়েছে, গল্পকার তাকে রূপ দিচ্ছেন তাঁর কবি-আত্মার আবেগ সহযোগে-

"বিনা কাজের সেবা হতে ফিরে ঘরে ঢুকবার সময় রোজ যে কথাটি মনে হয়, বন্ধ দুয়ারের তালা খুলতে খুলতে আজও সেই কথাটিই আমার মনে চির ব্যথার বনে দাবানল জ্বালিয়ে যাচ্ছে। একে একে সব ঘরেই প্রদীপ জ্বলবে, শুধু আমার একার ঘরেই আর কোনদিন সন্ধ্যা জ্বলবে না। সেই ম্লান দীপ শিখাটির পাশে আমার আসার আশায় কোনো কালো চোখের করুণ কামনা ব্যাকুল হয়ে জাগবে না।

বাইরে আমার ভাঙা দরজায় উতল হাওয়ায় শুধু একরোখা বুক চাপড়ানি আর কারবালা মাতন রণিয়ে উঠল, হায়গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা **

আমার হিয়ার চিতার চিরন্তনী ক্রন্দনী সাথে-সাথে কেঁদে উঠল, হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহারা।"[৪১]

প্রেম বিরহের এই হাহাকার, গল্পকারের মনোবনে যেন বিরহের দাবানল জ্বালিয়ে যায়। চারিপাশের দীপ-জ্বালানো স্নেহ-নিকেতন যেখানে মিলনানন্দে মশগুল, সেখানে গল্পকারের হৃদয়ে, আঁধার কুটির রূপ উদাসী বিরহ-ব্যথা, একটা বিষমাখা অভিশাপ 'শেলের' মতো যেন জেগে থাকে। গল্পকারের কবি-মন তখন যেন উদাসী সুরে বলে ওঠে-

"সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে,
তব গৃহে জ্বলে বাতি।
হাসিয়া ফুরায় তব উৎসব নিশি
প্রিয় পোহায় না মোর রাতি।
আমার গানের ঝরাফুলগুলি ল'য়ে
দোলে তব গলে মিলনের মালা হয়ে,
তোমার ভবনে আলোর দীপালি জ্বলে
আঁধার আমার সাথী।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি।"[৪২]

কবি নজরুলের বিষাদঘন মনের এই অতলান্ত শূন্যতা (সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে) গল্পকার নজরুলের শূন্য চিত্তটির মধ্যে মিশে যেখানে বলে ওঠে-'আমার হিয়ার চিতার চিরন্তনী ক্রন্দসী সাথে সাথে কেঁদে উঠল," সেখানে প্রকৃতির ভাবানুষঙ্গে গল্পকারেরই কবি-আত্মা বুঝি বলে ওঠে-

"আমার গানের ঝরাফুলগুলি ল'য়ে, দোলে তব গলে মিলনের মালা হয়ে তোমার ভবনে আলোর দীপালি জ্বলে আঁধার আমার সাথী। প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি।"

এখানেই প্রেমের অন্তর্গঢ় অনুভবের রূপকার কবি নজরুলের কবি-আত্মা আর গল্পকার নজরুলের বিরহী সত্তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শোনা যায় এক সুরের অনুরণন।

স্রষ্টার বিদ্রোহের তীক্ষ্নতা পাঠক সাধারণের মনে যত সহজে সাড়া জাগাতে পারে, অন্তরের স্নেহ-প্রেম-মাধুর্যের স্নিগ্ধতা বোধহয় তাৎক্ষণিকভাবে তা পারে না। স্রষ্টা নজরুলই তার জীবন্ত প্রমাণ। তিনি রুদ্র হয়েও যে রসবন্ত, বিদ্রোহী হয়েও যে বিরহী প্রেমিক, সৌন্দর্যের পূজারী, পরাধীন ভারতের মানবাত্মার মুক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের 'হুজুগে' তা অনেকেরই অবিদিত ছিল। তাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতির উপলব্ধি, প্রশান্ত প্রেমের লাবণ্য মাধুর্য যে অপূর্ব সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছে, আর তার মূল্যও যে কম নয়, তা তখন

সাধারণের নিকট ছিল অজ্ঞাত। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, "সমস্ত ঝড়ের অন্তরালে যেমন একটি গভীর শান্ত, একটি ধ্যানমৌন বিষাদের ভাব নিহিত থাকে, একটি প্রদীপের শিখায় যেমন দাবানল জ্বলে ওঠে আবার সেই প্রদীপের প্রাণের স্নিগ্ধ তৈলে শান্তির মহিমা যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি নজরুলের ঔদার্য, তেজ ও মোহের মধ্যে দাহনদীপ্তির অতুলনীয় সৌন্দর্য, রুদ্ররুক্ষতার মধ্যে তাঁর জীবনের স্নেহ- প্রেম-মানবতা লক্ষ্য করা যায়।"[৪৩]

বাস্তবিকই বিদ্রোহ-বিপ্লব নজরুলের সৃষ্টির প্রধানতম সুর হলেও ভাঙার গানেও নজরুল সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতা ছড়িয়েছেন। জাহান্নামের আগুনে বসেও তিনি পুষ্পের হাসি হাসতে পেরেছেন। কবিগুরু গ্যেটে বলেছিলেন সৌন্দর্য নিসর্গের গূঢ় নিয়ম সকলের অভিব্যক্তি, সৌন্দর্য সান্নিধ্য ছাড়া যারা কখনই প্রকাশ পেত না। স্রষ্টা নজরুলও সৌন্দর্যের অভিসারী বলেই তো লিখতে পারেন-

"কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে
হে পরম সুন্দরের পূজারী! হবে তারে বিনাশিতে।"

এই অসুন্দরের বিনাশ ঘটাতে চান বলেই তো নজরুলের সৌন্দর্য চেতনা শুধু বজ্রের অগ্নিতেই নেই, ফুলের গন্ধেও থাকে। পক্ষান্তরে তাঁর বিষের বাঁশিতে শুধু সঙ্গীতই বাজে না, বাজে কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যে অসত্য ধ্বংসের সঙ্গীতও। বসন্তের উল্লাস শুধু সুন্দর নয়, নটরাজ রুদ্রের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব নর্তনেও তা বিভাসিত। ‘মম এক হাতে বাজে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী/আর হাতে রণতূর্য।’ এই হ’ল নজরুলের সৌন্দর্য চেতনার সারাৎসার তত্ত্ব।

নজরুলের কাব্য Realism Romanticism-এর মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে রোমান্টিক কবির ধর্ম সম্পর্কে ভাব-বিলাসিতাও আমরা দেখতে পাই, যা যুগে যুগে মানুষের জীবনে এই ধরনের (ভাব বিলাসিতার) অনুভূতি আনে। মহান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অপ্রতিহতভাবেই Realism ও Romanticism-এর সমন্বয় দেখা যায়। যেমন, Realistic বাল্‌জাকেও (১৭৯৯-১৮৫০) আমরা দেখতে পাই ‘La peau de chagrin’ লিখতে। তুর্গেনিভ গোগল থেকে শেখড় বুনিন পর্যন্ত বিখ্যাত রুশ লেখকদের সৃষ্টিতে Romanticism-এর প্রভাব পড়তে। আসলে, যে মহান সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা (Realism), ব্যক্তিতন্ত্রতা (Individualism), বিশ্বতন্ত্রতা (Universal) এবং স্বভাবতন্ত্রতার (Naturalism) সমন্বয় মাধুর্যে আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে, কবি নজরুলের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোও সেই মানদণ্ডেই মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। কবি নজরুলের এই স্বভাবী সৌন্দর্যের মাধুর্য তাঁর গল্পগুলোকেও মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে।

নজরুলের গল্পগুলোতে দেখা যায়, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য গল্পকার নজরুলের অন্তরে তুলেছে নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা, আবেগ। সেই প্রকৃতির আবেগময় দৃশ্যকে গল্পকার নজরুল প্রেমের দর্শনে প্রতিফলিত করেছেন কবির ভাবনায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক কবি বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ। নজরুলের কবিতার মতো তাঁর গল্পগুলিতেও প্রিয়া যেন প্রকৃতির স্থান অধিকার করে আছে। কবির পক্ষ থেকে, তাঁর বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বরমার উপাসনা, গল্পকার নজরুলকেও যেন প্রেম-সত্যের গভীরে নিয়ে গেছে। প্রেমের পরিণতি সুন্দরের অভিসারে। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে চির-বিরহীর কামনা আরক্তিম দীপ্তিতে ভাস্বর করে, গল্পকার নজরুলও প্রেমের পরিণতিকে ধাবিত করেন সেই সুন্দরের অভিসারে। ছোটগল্পের শৈল্পিক বিচারে, গল্পকারের এই চৈতন্যের প্রকাশ অধিক ‘কবিত্ব’ দোষে দুষ্ট বলে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু নজরুলের ছোটগল্পে প্রকৃতির ব্যবহার, গল্পের ভাবাত্মা প্রকাশে যেখানে গীতি

কাব্যোচিত প্রতীকী ব্যঞ্জনা দান করে এবং গল্পকারের ইপ্সিত জীবন ভাবনা প্রকাশের শিল্পমূল্য আনয়নে উপযোগী হয়ে ওঠে, সেখানে এই 'কবিত্ব'ই যেন হয়ে ওঠে তাঁর সাফল্যের ভূষণ। 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই গল্পকার নজরুলের হৃদয়গত বোধের বিন্যাসে চৈতন্যের শুদ্ধিকরণ ভাব থেকে উদ্ভূত। সেখানে চরিত্রগুলির উদ্দাম দেহ কামনা কবি নজরুলের চির সুন্দরের স্বপ্নে তন্ময় হয়ে উঠেছে। গল্পের বিষয়ের সঙ্গে কবি নজরুলের সেই তন্ময়তা, গল্পকার নজরুলের চেতনার অন্তর্মূল থেকে উৎসারিত হয়ে, বোধদীপ্ত সাযুজ্য রক্ষা করেছে। এখানেই নজরুলের গল্পগুলি কবি ও গল্পকার নজরুলের একই চৈতন্য বিভায় ভাস্বর হয়ে আছে।

পর্বাঙ্গ-গ

প্রকৃতি ও মানবসত্তার অচ্ছেদ্য রূপ:

"ব্যথা দিয়ে প্রাণ ব্যথা না পায়/ওগো, অকরুণ, লহ বিদায়
এ পথে যায় না পথিক, ভুল করে রূপ সন্ধানে,
এ মেঘে নাই বরিষণ, চমকে চিকুর বাজ হানে,
কাঁটা-নিকুঞ্জে এ মোর আর না মুকুল মুঞ্জরে।
উদাসীর মন বেঁধে না আর নয়নের ফুল-শরে,
ভুলে গেছে পাখি তার সুর সাধায়।
আমারে চাও না যদি চাও মালিকার বন্ধনে,
পূজারীর প্রাণ না চাও খালি ধূপ-চন্দনে,
ফিরে যাও যাও মধুকর আর নিলাজের গুঞ্জনে।
ছলনার জাল বুনো না এই বেদনার ফুল-বনে,
মিছে চেয়ে থাকা মোর মন কাঁদায়।"

প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর মানবীয় সত্তা আরোপ কবি নজরুলের রোমান্টিক ধ্যানতন্ময়তার আরেক আধুনিক প্রকাশ। 'বাদল বরিষণে', 'সাঁঝের তারা' ও 'শিউলিমালা' গল্প তিনটি যেন তাঁর সেই রোমান্টিক ধ্যানতন্ময়তার আত্মতৃপ্তিতে আত্মস্থ। প্রাবন্ধিক নজরুল নিজেই বলেন-

"সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা করুন না কেন, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোনো লোক বলিতে পারে, ইহা তাহারই অন্তরের অন্তরতম কথা, ইহা তাহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। এইরূপেই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকেই বলে সর্বজনীনতা।"[৪৩]

নজরুলের বিদ্রোহব্যঞ্জক কবিতা যে কোনো পরাধীন দেশের পাঠকদের মনে আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। অনুভব আনে শাশ্বত সত্যের ও সর্বজনীনতার। এই শাশ্বত স্বদেশ প্রেমের পাশাপাশি নজরুলের বেশ কিছু প্রেমব্যঞ্জক কবিতাও সর্বজনীন রসাস্বাদনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রেম-ব্যঞ্জক কবিতায় দেহকেন্দ্রিক প্রেমের উত্তপ্ত স্পর্শ থাকলেও, প্রেমের শাশ্বত আদর্শেই সেই কবিতার উত্তরণ ঘটেছে। নজরুল নিজেই বলেন, 'সাহিত্য ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য, তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়।' 'সাঁঝের তারা', 'বাদল বরিষণে', 'শিউলিমালা' প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতীকী ব্যঞ্জনা ব্যবহার করে, নজরুল তাঁর গল্পগুলিতেও প্রেম-বিরহের শাশ্বত সত্যাদর্শের রসাস্বাদন পরিবেশন করেন।

প্রাকৃতিক রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ রোমান্টিক কবি প্রকৃতিকেই তাঁর মানস-প্রিয়া করেছেন, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এমন নজিরের অভাব নেই। কিন্তু নজরুল যখন তাঁর আবেগাপ্লুত রোমান্টিক কল্পনায় সাঁঝের তারাকে তাঁর প্রিয়ার রূপে দেখেন, তখন তাঁর সেই দেখা প্রকৃতি যেন মানবীয় গুণে নড়ে চড়ে ওঠে অন্য সুরে, অন্য প্রতিভার রঙে-

"সপ্তর্ষির তারা পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ রাণী
সোহেলি 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি মশারি টানি
সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে। '
মঙ্গল' তার মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে বুঝি বঁধুর নিঃশ্বাস লাগে।
উল্কা জ্বালার সন্ধানী আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কালপুরুষ' সে জাগি বিনিদ্র করিতেছে পায়চারি॥"[৪৫]

এখানে 'সোহেলি লায়লি'-আর কেউ নয়, কবির মানস বঁধু-আকাশ রাণী, সাঁঝের তারা। এই কবি নজরুলই লিখলেন 'সাঁঝের তারা' গল্প। এখানে সাঁঝের তারার সঙ্গে প্রেয়সী সম্পর্ক স্থাপন করে, তার ওপর কবির কাব্যলক্ষ্মী সত্তা আরোপ করেছেন গল্পকার। সাঁঝের তারাকে গল্পকার করে তুলেছেন যেন তাঁরই কল্যাণ-দায়িনী মানবী প্রিয়া।

আরব সাগরের বেলাভূমের উপরে, একটি ছোট্ট পাহাড়ে আপনভোলা মনে বসে আছেন সৈনিক গল্পকার। যুদ্ধের ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত তিনি। ভারাক্রান্ত তাঁর প্রেম-বিরহের স্মৃতি রোমন্থনও। তন্দ্রালসা সুষুপ্তির মধ্যে ফেলে আসা অতীত দুঃখ-স্মৃতি গান (রবীন্দ্রসঙ্গীত) হয়ে বেজে ওঠে তাঁর উদাসী হৃদয় বীণায়-

"অশ্রু নদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।"[৪৬]

কখনো একাকীত্ব মনে তার ঘুম-পিপাসিত চিত্ত, কবির ভাষায় গেয়ে ওঠে এই পূরবীর সুর-

"বেলা গেল তোমার পথ বেয়ে
শূন্য ঘাটে একা আমি/পার করে নাও খেয়ার নেয়ে।"[৪৭]

শ্রান্তির রাজকন্যাকে ডিঙিয়ে গল্পকারের তন্দ্রালুপ্ত আবেগঘন কবি-মন ঘুমের রাজকন্যার অতলান্ত কুহেলিকায় প্রবেশ করলো। কল্পনার আয়নায় সেখানে ভেসে উঠলো সাঁঝের তারা, কবি-গল্পকারের হারানো লক্ষ্মী-

"আমি চমকে সামনে চাইতেই দেখলাম, আকাশের মুক্ত আঙিনায় ললাটের আধফালি ঘোমটায় ঢেকে প্রদীপ হাতে সাঁঝের তারা দাঁড়িয়ে। তার চোখের কিনারায়, মুখের রেখায়, অধরপুটের কোণে কোণে দুষ্টুমির হাসি লুকোচুরি খেলছে। বারে বারে উছলে উঠা নিলাজ হাসি ঠোটের কাঁপন দিয়ে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার হাতের মঙ্গল প্রদীপ কেঁপে কেঁপে লোপ শিখা বাড়ির সুন্দরীর রাঙা গালে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দেওয়ার জন্য আকুলি বিকুলি করছে।"[৪৮]

গল্পকারের উদাসী কবি-হৃদয়ে জেগে ওঠে এই সন্ধ্যালক্ষ্মীর রহস্যময়ী রূপ-

"গোধুলি বেলায় ফুটিবে উঠানে সন্ধ্যামণির ফুল,
তুলসীতলায় করিতে প্রণাম খুলে যাবে বাঁধা চুল।
কুন্তল-মেঘ ফাঁকা অবিরল/অকারণে চোখে ঝরিছে গো জল,
সারা শর্বরী বাতায়নে বসি নয়ন প্রদীপ জ্বালি-
খুঁজিবে আকাশে কোন তারা কেঁপে তোমারে চাহিয়া খালি।।"[৪৯]

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি পঙ্ক্তি-

"খুঁজিতেছি কোথা তুমি
কোথা তুমি।
যে অমৃত লুকানো হিয়ায়
সে কোথায়।
অন্ধকারে সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে
যেমন স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম।
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে কাঁপিছে তেমন
আত্মার রহস্য শিখা।"[৫০]

এইভাবে সাঁঝের তারার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আত্মার রহস্য-শিখার অনুসন্ধান করেছেন, নজরুল কিন্তু তাঁর সাঁঝের তারার মধ্য দিয়ে তা অনুসন্ধান করেননি। করেননি কোন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টাও। সাঁঝের তারার নীলাভ আঁখির দৃষ্টি নজরুলের কাছে মনে হয়েছিল কোনো রহস্যময়ীর আহ্বান। আর এই আহ্বানে আঁখির গঙ্গা-যমুনায় দুর্বার জোয়ার আসে। প্রশ্ন জাগে মনে-এ দৃষ্টি কি সপ্তর্ষির অনন্ত বাসনা যা কাব্যের অমরাবতী? এ কি সেই ইন্দিরা? তাঁর কবিতালক্ষ্মী? মনে জাগে কামনা। গল্পকার তাই কবির ভাষায় তাঁর প্রিয়তমা সন্ধ্যালক্ষ্মী সাঁঝের তারাকে তাঁর কাছেই নেমে আসার আহ্বান জানালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে-

"একটু তাকিয়েই সিঁদুরে আমের মতো রেঙে ওঠে আধ ফোটা কথায় কেঁপে কেঁপে বললে, না প্রিয়, আমায় পেতে হলে তোমাকে এই তারারই একটি হতে হবে। আমি নেমে যেতে পারিনে, তোমাকে আমার পথেই নেমে আসতে হবে। ...তোমায় কল্যাণের পথে না আনতে পারলে তো আমি তোমার লক্ষ্মী হতে পারিনে।”[৫১]

এই বলে অন্তর্হিতা হলো সন্ধ্যাতারা। ‘বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙানোর’ কামনার আবেশ, যখন মনকে করে তোলে ‘প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর’, তখন গল্পকারের মানসপ্রিয়া সন্ধ্যালক্ষ্মী সাঁঝের তারাই তাঁকে দেখালো কামনা ঊর্ধ্বে কল্যাণের পথ। গল্পকারের কবি-মন তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিয়ে বাস্তব ভোরে চোখ মেলে তাকালো। প্রিয়তমা সন্ধ্যালক্ষ্মীকে হারিয়ে পূরবীর মূর্ছনার মতোই একটা করুণ বিরহের রাগিনী তাঁর অন্তরকে কাঁদিয়ে তুললো-

“.... ....

কাল যে আছিল মধ্যগগনে আজি সে কোথায় হারায়
সাঁঝের তারা সে দিগন্তের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ততোরণ পার সে দেখায় কিরণের ইশারায়।"[৫২]

এইভাবে, কবির রোমান্টিক কল্পনায় সাঁঝের তারাকে মানস-প্রিয়া করে, তার কাছ থেকে ভোগ আর বৈরাগ্যের শিক্ষায় গল্পকার এই যে চিরন্তন সত্যের সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, তাতে গল্পকার নজরুলের অন্তরের চির রোমান্টিক কবি-আত্মার অভিনব প্রকাশই আমাদের করে মুগ্ধ। সাঁঝের তারার সঙ্গে প্রেয়সী সম্পর্ক স্থাপন করে, তার উদয়-অস্তে হর্ষ-বিষাদ চেতনায় শাশ্বত কল্যাণ সত্যের উপলব্ধির মতো অভিনবত্ব, বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম বোধহয় নজরুলই দেখালেন।

অবশ্য, অস্তপারের সন্ধ্যালক্ষ্মী সাঁঝের তারার ওপর মানবীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করে এবং তার সঙ্গে প্রণয়সূচক বেদনার্দ্র ভাষায় কাহিনী সৃষ্টি করে নজরুল সাঁঝের একটি অনুভূতিপ্রবণ কল্পনা প্রধান গল্পের আঙ্গিকে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন 'সাঁঝের তারা'-কে। কিন্তু গল্পটি নানাদিক থেকে দুর্বল। প্রথমত, আকাশের তারার সঙ্গে মানুষের কামনাসক্ত প্রণয়ের বিষয়টি উদ্ভট। দ্বিতীয়ত, চরিত্র নিরপেক্ষ, দ্বন্দ্বহীন কোনো কাহিনীকে শৈল্পিক বিচারে ঠিক গল্প বলা যায় না। তাছাড়া, সাঁঝের তারার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে এক বাচনিক থেকে যে দ্বিবাচনিকে (dialogical) গল্পকাহিনীকে পৌঁছে দিয়েছেন গল্পকার, তাতে অভিনব গল্পাঙ্গিকের জন্মদান করলেও শিল্পসম্মত গল্পের বৈশিষ্ট্যকে তিনি লঙ্ঘন করেছেন। এতে 'সাঁঝের তারা' গল্প শিল্পসম্মত গল্প হয়ে উঠেনি এটা ঠিক। কিন্তু অত্যন্ত আবেগপ্রবণ বিদ্রোহী কবি নজরুলকেও তো আমরা জানি। তাঁর সৃষ্টি চলে তাঁরই খেয়াল-খুশি মতে। তাঁর সেই অসংযমী যৌবনোদীপ্ত খাপছাড়া বিদ্রোহেই রয়েছে তাঁর প্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষর। 'সাঁঝের তারা' গল্পটি রোমান্টিক কবি নজরুলের সেই উদ্দাম কল্পনারই সাক্ষ্য বহন করে।

ঋতু প্রকৃতি মানব জীবনের প্রবৃত্তিজনিত অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। আর সকল ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতু মানব-হৃদয়ের বিরহ-ব্যথাকে অভিভূত করে সবচেয়ে বেশি। নিরন্তর বাদল বরিষণে কখনো হারানো প্রিয়াকে অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী ভেবে সে ব্যথা পায়-

"নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী।"[৫৩]

আবার কখনো বিরহী প্রেমিক মেঘকে দূত করে পাঠিয়ে প্রিয়াকে শোনাতে চায় সে তার বিরহের বাণী। এইভাবে গীতি-কবিতার খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে, বর্ষার সাড়ম্বর অভিষেকের কথা আমরা জানি। কথাসাহিত্যের শিল্পাঙ্গিকে, বাস্তবধর্মী জীবনচিত্রের মধ্যেও বর্ষা ঋতুর উপস্থিতি বিরল নয়। তার কারণ, মানুষের জীবনচর্যায় প্রকৃতির স্থান ও ভূমিকা অনবচ্ছেদী। নজরুলের 'বাদল-বরিষণে' গল্পে, দয়িতের প্রাণ বর্ষা অনুষঙ্গে এসে কেঁদে ওঠে বিরহ-ভারে। তার খাপছাড়া জীবনে দয়িতার স্মৃতিগুলি উড়ে যায় ঝড়ের মুখে পদ্মবনের মতোই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে। তার আহত মানসে কামনাগুলো যুই কুঁড়ির মতোই যেন ফুটতে গিয়েও পারে না ফুটতে। আর তারই সাথে ঐ শাওনঘন দেয়া গরজনে ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি তাকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যায়।

কাজরী উৎসব বর্ষার উৎসব। মহারাষ্ট্রের কালিঞ্জর অঞ্চলে শ্রাবণ শুক্লা পঞ্চমীতে বর্ষামুখর পরিবেশের যে উৎসব, তাই কাজরী উৎসব। এই কাজরী উৎসবে যুবতীদের উচ্ছ্বসিত হৃদয়োল্লাসের গান বর্ষানুষঙ্গে গল্পকার নজরুলকে করে তুলেছে প্রেমিক কবি। বর্ষার মল্লার রাগিনীর করুণ সুরে গল্পকার নজরুলের হৃদয় হরণ করে নিয়েছে এক কৃষ্ণকায়া যুবতী কাজরিয়া। শ্রাবণ শুক্লা পঞ্চমীতে কাজরী উৎসবের আনন্দঘন পরিবেশে কালো এই কাজরিয়ার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল ভিনদেশী নায়কের অন্তরালে গল্পকার নজরুলেরও। খাপছাড়া জীবনের দাগা পাওয়া বুকে কাজরির কাজল মাখা কালো চোখের দৃষ্টি তাকে উদাস করে দিল। কাজরিয়া গেয়ে ওঠে- "ঘুঙ্ঘট পট খোলো আরে সাঁবলিয়া। ওগো শ্যামল, এখন তোমার ঘোমটা খুলে ফেল।" প্রথম দৃষ্টিতেই জাগলো প্রেম। কাজরিয়া খুলতে চাইলো তার মনের ঘোমটা। উদাস পথিক নায়ককে সে আকৃষ্ট করে, কিন্তু নিজে কালো বলে পারে না ধরা দিতে। কাজরিয়া গেয়ে ওঠে অতৃপ্ত পিপাসায়-

"চঢ়ে ঘটা ঘন ঘোর গরজ রহে বদরা রে হোরি।
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ পাণি বরযৈ রহি রহি জিয়া ঘাবরাবৈ রামা
বহৈ নয়নাসারে নীর ময়েল্ ভয়ি করা রে হোরি।"[৫৪]

অর্থাৎ "ঘোর ঘটা করে গগনে মেঘ করেছে, বাদল গর্জন করছে, রিম্ ঝিম্ রিম ঝিম্ বৃষ্টি ঝরছে, থেকে থেকে জান আমার ঘাবড়িয়ে উঠছে, নয়ন বেয়ে আঁসু ঝরছে-ওগো চোখের কাজল আমার মলিন হয়ে গেল।" এ যেন পূর্বমেঘ আর উত্তর মেঘের বেণীবন্ধন। একদিকে মিলনের আকুতি-

"রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঘন দেয়া বরষে
কাজরী নাচিয়া চলে পুরনারী হরষে
কদম তমাল ডালে দোলনা দোলে
কুহু পাপিয়া ময়ূর বোলে,
মনের বনের মুকুল খোলে নটশ্যাম সুন্দর মেঘ পরশে।
হৃদয় যমুনা আজ কূল জানে না গো
মনের বাধা আজ বাধা মানে না গো।
ডাকিছে ঘরছাড়া ঝড়ের বাঁশি,
অশনি আঘাত হানে দুয়ারে আসি
গরজাক্ গুরুজন ভবনবাসী
আমরা বাহিরে যাব ঘনশ্যাম দরশে॥"[৫৫]

অন্যদিকে বিরহের অতলান্ত গহ্বরতা-

"শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে।
ভুলিও স্মৃতি মম, নিশীথ স্বপন সম,
আঁচলের গাঁথা মালা, ফেলিও পথ পরে।।
ঝুরিবে পূবালি বায় গহন দূর বনে,
রহিবে চাহি তুমি, একেলা বাতায়নে।

বিরহী কুহু কেকা গাহিবে নীপ-শাখে
যমুনা নদী পারে শুনিবে কে যেন ডাকে
বিজলী দীপ-শিখা খুঁজিবে তোমারে প্রিয়া
দু'হাতে ঢেকো আঁখি যদি গো জলে ভরে।"[৫৬]

কবি নজরুলের বর্ষা প্রকৃতির এই হর্ষ-বিষাদের ভাবানুষঙ্গটি গল্পকার নজরুলের 'বাদল বরিষণে' গল্পের প্রেম-বিরহের মর্ম সত্যের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। কাজরিয়ার শূন্য হৃদয়ে মিলনের দোলা লাগাতে ভিনদেশী বঁধু আসে না। কিন্তু সেই বন্ধন ভীরু উদাস পথিক বঁধুও কাজরিয়ার বিরহিনীর শূন্য বুকের সুরে সুর মিলিয়ে বলে ওঠে, -'ওগো প্রিয়, চোখের কাজল আমার মলিন হয়ে গেল।' এই একটিমাত্র বাক্যে গল্পকার নজরুল শুধু প্রিয়র চোখের জলের গভীরতাই ফোটাননি, প্রিয়র বুকে ধরা দিতে না পারার গভীর ক্রন্দনের আর্তিকেও ব্যঞ্জনাবহ করে তুলেছেন।

এক বছরের দীর্ঘ বিরহের পর আবার এলো 'শ্রাবণ-শুক্লা-পঞ্চমী'-কাজরী উৎসবের আনন্দঘন মিলন মুহূর্ত। এতদিনের বিরহ ব্যথায় কাজরী কামনার অসারত্ব বুঝতে পেরেছে। অবশ্য, গল্পকার কাজরীর কৃষ্ণকায় শরীরের সঙ্গে ভাললাগা আর ভালোবাসার মৃদু দ্বন্দু-সংঘাত এনে কাজরীকে করে তুলেছেন অন্তর্মুখী। এখানেই গল্পকার সুকৌশলে গল্পের বিষাদঘন প্রেমের মর্ম সত্যটির বীজ বপন করে দিলেন। নিজের কালোবর্ণ সম্পর্কে কাজরীর অন্তর্দ্বন্দু কাজরীকে করে তোলে চাপা অভিমানিনী। আত্মদৈন্য পীড়িতা কাজরীর ধারণা, কালো বলেই সে সকলের উপহাসের পাত্রী। তার বিশ্বাস, কেউ তাকে ভালোবাসেনি, ভালোবাসতে পারে না। কিন্তু গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি, এক ভিনদেশী উদাসী শ্যামল তরুণ তাকে হৃদয় দিয়েই ভালোবেসেছে। আর সেই অপ্রত্যাশিত প্রেম প্রাপ্তির আনন্দ ও ভালোবাসার পূর্ণ গৌরব নিয়ে সে বিদায় নিয়েছে। সমালোচক বলেন-

'তার কালো রূপ মিশে যায় বর্ষার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে। নৈরাশ্য আর চিত্তবৈকল্যে আহত নিবিড় কালো 'কাজরী' স্বভাবতই সংবেদনশীল পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করবে।'[৫৭]

কাজরীর প্রতি মরমী ভিনদেশী পথিকের প্রেম প্রকাশের অন্তরালে দরদী গল্পকার নজরুলের কবি-আত্মার উদার সহানুভূতিশীল মনটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে গল্পকার নজরুলের কবি-আত্মাটিই যেন একাত্ম হয়ে ওঠে নিম্নোদ্ধৃত এই কয়েকটি পঙক্তিতে-

"কাজল সুস্নিগ্ধ কার অঙ্গুলি পরশ
বুলায় নয়নে মোর, দুলায় অবশ
ভার শ্লথ তনু মোর ডাকে 'জাগো প্রিয়া'।
জাগোরে সুন্দর মোরি রাজা শাঁবলিয়া।
জল-নীলা-ইন্দ্র-নীলকান্ত-মণি শ্যামা
এ কোন মোহিনী তন্বী যাদুকরী বামা
জাগলো উদয় দেশে নব মন্ত্র দিয়া
ভয়াল আমারে ডাকি হে সুন্দর-প্রিয়া।"[৫৮]

এখানে বর্ষা প্রকৃতির স্নিগ্ধ, সজল, শ্যামল শান্তরূপ নারী মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বর্ষার সুস্নিগ্ধ পরশ হয়ে উঠেছে যেন প্রিয়ার পরশ। 'জাগোরে সুন্দর মোরি রাজা শাঁবলিয়া'-এ যেন 'বাদল বরিষণে' গল্পের গল্প-কথক নজরুলের কাজরী রূপী প্রিয়ার প্রেম-স্মৃতিরই ধ্যান-

"এস মোর শ্যাম সরসা
ঘনিমায় হিঙুল শোষা
বরষা প্রেম-হরষা
প্রিয়া মোর নিকষ-নীলা।
শ্রাবণের কাজলগুলি
ওগো আয় রাঙিয়ে তুলি,
সবুজের জীবন তুলি;
মৃতে কর প্রাণ রঙিলা॥"[৫৯]

আপাতদৃষ্টিতে 'মেঘদূত' কাব্যের বিরহ, ব্যক্তি বিশেষের বিরহকে উপলক্ষ্য করে রচিত হলেও কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রস-ভাষ্য রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ বিরহের মধ্যে আবিষ্কার করেন একটি চিরন্তন বিশ্বজনীন সত্য-

"কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শী বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানস-সরোবরের অগমতীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই।"[৬০]

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে ব্যবধান তার সবটা আমরা আমাদের প্রেম দিয়ে কখনোই ভরাট করতে পারি না। প্রেমিকও পারে না প্রেমাস্পদের মনোলোকের সব রহস্য ভেদ করতে। এর ফলে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, প্রিয়র সঙ্গে প্রিয়ার, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার অতলান্ত বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এই অনিবার্য বিচ্ছিন্নতার জ্বালাই বিরহ জ্বালার রূপান্তরে দগ্ধ করে পরস্পরের মন। তখন ঋতু প্রকৃতির সজল স্নিগ্ধতা যেন পরস্পরের বিরহ ব্যথাকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে উভয়কে করে তোলে শুদ্ধ, শান্ত-সংযত। 'বাদল বরিষণে' গল্পের মর্মসত্যও এখানেই।

সত্য-সৌন্দর্য বাইরে নয়, অন্তরে। দেহে নয়, হৃদয়ের গহনলোকে। এই শাশ্বত সত্যের সন্ধান পেয়ে কাজরী বুকভরা অভিমান নিয়েও দয়িতের প্রেমাদশ রক্ষা করলো। শ্রাবণ পঞ্চমীর যে মিলনোৎসবে পরদেশী শাঁবলিয়াকে সে তার হৃদয়ের ঘোমটা খোলার আহ্বান জানিয়েছিল, বিদায়ক্ষণে সেই পরদেশী বধুকেই সে জানিয়ে যায়-

"হায় রে পরদেশী শাঁবলিয!, তোমার এই অবগুণ্ঠন আর জীবনে খুলল না। খুলবে না.... "[৬০]

যে প্রেমিক চির উদাসী পথিক, যে প্রেমিক বন্ধনে ভীরু, বিচ্ছেদের স্মৃতি রোমন্থনে যে নিজেকে অনুভব করার পূর্ণতা পায়, তার পক্ষে অন্যের প্রেমের ঘোমটা খোলা তো কখনোই সম্ভব হয় না। তাই বিরহ-ব্যথাতেই নিজের অন্তর অভিষিক্ত করে 'বাদল বরিষণে' গল্পের সেই গরদেশী শাঁবলিয়ার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গল্পকার নজরুলেরই চির-বিরহী কবি আত্মা বলে উঠতে পারে-

"পরদেশী মেঘ যাও রে ফিরে/বলিও আমার পরদেশী রে।।

সে দেশে যবে বাদল ঝরে/কাঁদে নাকি প্রাণ একেলা ঘরে,
বিরহ-ব্যথা নাহি কি সেথা/বাজে না বাঁশি নদীর তীরে।।
বাদল-রাতে ডাকিলে পিয়া-পিয়া-পাপিয়া/বেদনায় ভরে ওঠে নাকি রে কাহারো হিয়া,
ফোটে যবে ফুল, ওঠে যবে চাঁদ/জাগে না সেথা কি প্রাণে কোন সাধ,
দেয় না কেহ গুরু গঞ্জনা/সে দেশে বুঝি কুলবতীরে।।"[৬২]

আবার গল্পকার নজরুল যখন বলেন-

"আজ যখন আমার ক্লান্ত আঁখি সামনে আকাশ ভাঙা ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে, পূরবী বায়ু হু হু করে সারা বিশ্বের বিরহ কান্না কেঁদে যাচ্ছে, নিরেট আঁধার ছিঁড়ে ঝড়ের মুখে উগ্র মল্লারের তীব্র গোঙানি ব্যথিয়ে উঠছে।”[৬৩]

তখন এই গল্পকার নজরুলেরই পূরবী বায়ুর মতো হু হু করা বিরহ কান্না, কবি নজরুলের বাদল রাতের বিরহী পাখির উদাস কান্নায় যেন একাত্ম হয়ে ওঠে-

"বাদল রাতের পাখি।
কবে পোহায়েছে বাদলের রাতি, তব কেন থাকি থাকি
কাঁদিছ আজিও ‘বউ কথা কও’ শেফালির বনে একা,
শাওনে যাহারে পেলে না, তারে কি ভাদরে পাইবে দেখা?
তুমি কাঁদিয়াছ ‘বউ কথা কও? সে কাঁদনে তব সাথে
ভাঙিয়া পড়েছে আকাশের মেঘ গহীন শাওন রাতে।
... ...
ভিনদেশী পাখি? আজিও স্বপন ভাঙিল না হায় তব,
তাহার আকাশে আজ মেঘ নাই-উঠিয়াছে চাঁদ নব।
ভরেছে শূন্য উপবন তার/আজি নব নব ফুলে,
সে কি ফিরে চায়/বাজিতেছে হায় বাঁশি/যার নদীকূলে
বাদল রাতের পাখি।
উড়ে চল্ যেথা আজো ঝরে জল,
নাহিকো ফুলের ফাঁকি।" [৬৪]

শরৎ ঋতুর প্রাকৃতিক উপহার শিউলি। শিশির ভেজা প্রভাতে শিউলি যেন মানব জীবনের পুষ্পাঞ্জলির অর্ঘোপচার। বেলা বাড়ে, শিশির শুকোয়, কমে তার সৌরভও। শেষে রোদের তাপ দগ্ধতায় সেই শিউলি ফুল যায় ‘আউড়ে’। শরতের সমস্ত আকাশ- বাতাস ভরে ওঠে যেন কোনো এক অতলান্ত বিরহ-ব্যথা ভরে। প্রকৃতির অবদান শিউলি ফুলের এই পরিণতির সঙ্গে, ‘শিউলিমালা’ গল্পের মর্মসত্যটি কবিতার মতোই হয়ে ওঠে সংবেদনশীল।

সঙ্গীতজ্ঞ ও দাবায় আত্মনিষ্ঠ প্রাণ আজহার তরুণ ব্যারিস্টার। শিলং বেড়াতে এসে পরিচিত হ’ল সে আর এক দাবাপ্রেমী মিস্টার চৌধুরী ও তার মেয়ে শিউলির সঙ্গে। দাবার আসরেই হয় উভয়ের গোপন দৃষ্টি বিনিময়। ‘Love at the first sight’-এর সূত্র ধরে বিনিময় হয় পরস্পরের হৃদয়ও। আজহারের শিলং

উপভোগের প্রতি মুহূর্ত কেটেছে রোমাঞ্চঘন আনন্দে। কখনো সে শিউলির সঙ্গে দাবা খেলায় মেতে উঠেছে। কখনো বা সে শিউলিকে গান শিখিয়েছে এবং নিজেও শিখেছে। তখন আজহার উপলব্ধি করেছে-

"মনে হল আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।“[৬৫]

আবার, প্রায়শই তারা শিলং পাহাড়ের বিস্তীর্ণ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়েছে আপন মনে। প্রকৃতির উদার মুক্ত পরিবেশে, উভয়ের এই ঘুরে বেড়ানোর প্রাকৃত আবেশে দুটো হৃদয় আসে পরস্পরের আরো কাছাকাছি। অজানা থাকে না পরস্পরের চোখের ভাষা, আর হৃদয়ের উষ্ণ উত্তাপের অনুভবও। কিন্তু তবুও উভয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটি দূরত্বের ব্যবধান উভয়কেই রাখে উদাস-বিমর্ষ করে। "ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া-যত ভালবাসা, তত ভয়। ও বুঝি ছুঁলেই ধূলায় ঝড়ে পড়বে।"[৬৬]

এ যেন বর্ষার ঝরা বাদলে ভিজেও তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো পান না করতে পারার আকণ্ঠ তৃষ্ণার্তের ব্যথা-ব্যবধান। এ যেন সমুদ্রপারে অবস্থান করেও তৃষ্ণার্ত পথিকের জল পান করতে না পারার অসহায় যন্ত্রণা।

এই ব্যথা ব্যবধান নিয়েই অবশেষে আসে একদিন আজহারের বিদায়লগ্ন। দুটি হৃদয়ে বেজে ওঠে বিজয়ার বিরহ সঙ্গীত। বিদায় দিনের ভোরে, আজহারের ঘুম ভাঙে শিউলির করুণ ভৈরবী তানে। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে দেখে আজহার-দু’ হাতে শিউলির অঞ্জলি ভরে দেবীর ধ্যানে দাঁড়িয়ে শিউলি। চোখে তার জল। এ যেন সন্ধ্যালক্ষ্মী, এ যেন পূজারিণী দেবী। আজহারের-

‘মনে হল, সারা আকাশকে বঞ্চিত করে সন্ধ্যা আজ মূর্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তার দেহে রক্তধারা রঙের শাড়ি, তার মনে রক্তধারা, মুখে অনাগত নিশীথের স্নান ছায়া।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আজহার ভোরের ভৈরবী সুরের মোহ মুগ্ধতায় শিউলিকে অনুভব করেছে দেবী মূর্তিতে। বিদায়ক্ষণে অশ্রুসজল কণ্ঠে আজহার শিউলিকে জিজ্ঞেস করে-

"আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন এমনি আশ্বিন মাস, এমনি সন্ধ্যা তার তখন কি করবো বলতে পার?[৬৭]

শিউলি তার দু’চোখ ভরা ভাষা নিয়ে অশ্রুসজল কম্পিত কণ্ঠে বললো ধীরে ধীরে- ‘শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও।"[৬৮]

আজহার প্রত্যেক পয়লা আশ্বিন-সন্ধ্যায় শিউলি ফুলের মালা গেঁথে জলে ভাসিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিউলিকে জিজ্ঞেস করে,-

‘তুমি কি করবে? দুটি ঠোটের ভিতর থেকে এক প্রত্যাশিত বিরহ-সত্যের বেদনা মাখা হাসিতে জবাব দিল শিউলি-

"আশ্বিনের শেষে ত শিউলি ঝরেই পড়ে।"[৬৯]

‘শিউলিমালা’ গল্পের এই রূপকধর্মী পরিণতিতে, গল্পকার নজরুলের শিল্পী-আত্মায় আপতিত হয়, নজরুলের কবি আত্মার সেই পরিচিতি বিরহের মাধুর্য-

"ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী।
যাহারে সকল দিবি, তারে তুই দিলি শুধু বাণী?
সুরের সুরায় যেতে কতটুকু কমিল রে মর্মদাহ তোর?
গানের গহিনে ডুবে কতদিন লুকাইবি এ আঁখি লোর?
কেবলি গাঁথিলি মালা, তার তরে কেহ নাহি জানে
অকূলে ভাসায়ে দিস, ভেসে যায় মালা শূন্য পানে।
সেই শুধু জানিল না, যার তরে এত মালা গাঁথা,
জলে ভরা আঁখি তোর, ঘুমে ভরা তার আঁখি-পাতা
কে জানিবে কাটিবে কিবা আজিকার এ নিশীথ
হয়ত হবে না বলা বাণীর বুদ্বুদে যাহা ফোটে নিশিদিন।"[৭০]

-দু'টি হৃদয় নীরবে নিভৃতে গেঁথে গেল প্রেমের মালা,-শিউলি ফুলের মালা। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সেই মালা বদল হলো না কোনোদিন। আজহার ফিরে এল কলকাতায়। আজ তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে পবিত্র শুদ্ধতায় অবস্থান করছে শিউলির প্রেম। আজ আরেকটি আশ্বিন সন্ধ্যায় আজহারের অতলান্ত উদাসী বিরহী মন যেন কেঁদে বলে ওঠে-

"এপারে ওপারে মোরা নাই পাই কূল
তুমি দাও আঁখিজল, আমি দিই ফুল।"[৭১]

আজ আজহারের মনে পড়ছে, শিউলি থেকে বিদায় নেবার বিদায়ী প্রভাতের স্মৃতি। ভেসে ওঠে শিউলি ফুলের অঞ্জলি ভরা শিউলির দেবী মূর্তি। স্মৃতিভারে জর্জরিত আজহারের এই অন্তর্বেদনা কবি-নজরুলের বিরহ-বিধুর এই বেদনার সূরে যেন একাত্ম হয়ে ওঠে-

"ফুল কেন এত ভালো লাগে তব,
কারণ জান কি তার?
ওরা যে আমার কোটি জনমের
ছিন্ন অশ্রু-হার।
যত লোকে আমি তোমার বিরহে
ফেলেছি অশ্রু-জল
ফুল হয়ে সেই অশ্রু-ছুঁইতে
চাহে তব পদতল।"[৭২]

শিউলি শরৎ-প্রভাতের ঝরা ফুল। আনন্দময়ীর আগমন-বার্তা আনে শিউলির স্নিগ্ধ সৌরভ। মন-প্রাণ ভরে ওঠে তখন প্রেমের শুচি-শুভ্রতায়। কিন্তু পরক্ষণেই যখন ঝরা শিউলি অনাদরে অবহেলায় পদদলিত হয় উদাসী পথিক দ্বারা, তখনই মনটি যেন কোনো এক অজানা ব্যথার ভারে টনটন করে ওঠে। এই ব্যথা তখন যেন মিশে যায় কবির বিরহী মনের আসনে উপবিষ্টা তাঁরই অশ্রুমতী 'চিরজনমের প্রিয়া'র বিরহ ব্যথার সঙ্গে। প্রকৃতি চেতনায় কবি-সত্তা গল্পকার নজরুলের অনন্ত বিরহী সত্তায় মিশে অভিন্ন হয়ে রয়েছে এভাবেই।

উজ্জ্বল ভাষ্যে আছে-'অত্র দুঃখে সুখধর্ম এবানুভূয়তে নতু দুঃখধর্ম।' দার্শনিক শ্লেগেলও (Schlegel-1767-1829) বলেন-

"There is no bond of Love without a separation, no enjoy- ment without the grief of losing it"[৭৩]

বাস্তবিকই, প্রেমের মধ্যে মিলন ও বিরহ দুই-ই রয়েছে। মিলন ক্ষণিকের, বিরহ অনন্তের। প্রেমের অমৃত দীপ শিখাটিকে আগ্রহের স্নেহরসে প্রোজ্জ্বল করে রাখে এই বিরহ। তাই বিচ্ছেদ-বেদনাপূর্ণ মিলনের পাত্র থেকে যে গান উত্থিত হয়, সেই গান তত মধুর। 'শিউলিমালা' গল্পটির রস আবেদন এই বিরহেরই মাধুর্য। গল্পটির এই বিরহ মাধুর্যই কবি নজরুলের এই কয়টি পঙ্ক্তিতে সমচৈতন্যে যেন ভাস্বর হয়ে ওঠে-

"যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দু-বিরোধ, হে মোর জীবন স্বামী!
এবার এক হয়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি!
আপন সুখকে বড় করে/যে দুঃখ পেলাম জীবন ভরে
এবার তোমার চরণ ধরে/নয়ন জলে ভেসে
যেন পূর্ণ করে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে,
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে!
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে।"[৭৪]

'শিউলি মালা' (১৯৩১) গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি ছাড়া নজরুলের অপরাপর 'ব্যথার দান' (১৯২২) ও 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি ছোটগল্পের প্রত্যাশিত চাহিদা হয়তো পূর্ণ করেনি। সার্থক ছোটগল্পের জন্য যে পরিধি, পরিমিতিবোধ, সংযম, ভাব, ঐক্য ও গভীর ব্যঞ্জনা প্রয়োজন, তা অনেক গল্পেই অত্যধিক ভাবের অসংযমী উচ্ছ্বাস ও অমিতব্যয়ী স্বপ্ন কল্পনা-ময়তার (রোমান্টিকতার) জন্য সুগঠিত হতে পারেনি। তাই গল্পগুলোর বৈচিত্র্যও শৈল্পিক চাহিদার অনুকূল হতে পারেনি। গল্পগুলো একই ভাবনার বিচ্ছিন্ন কয়টি স্রোত যেন। প্রতিটি গল্পের ভিতর দিয়ে একটা উদাস ব্যথিত বিরহীর মূর্ত প্রকৃতি চেতনা গল্পের মর্মসত্য প্রকাশে সাযুজ্য রক্ষা করে, গল্পের সেই হাহাকারকে করে তোলে আরো মর্মস্পর্শী, হৃদয়গ্রাহী। অথচ বহু ক্ষেত্রেই ঐ বিরহ বা বিচ্ছেদের হাহাকার যে ঘটনার পরম্পরায় অপরিহার্য ছিল তা কিন্তু নয়। কিছু ক্ষেত্রে তা বন্ধন ভীরু নায়কের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত বলেই মনে হয়। হয়তো জীবন ও প্রেম প্রসঙ্গে পাপ-পুণ্য, প্রেয় ও শ্রেয়র প্রশ্নে বিধ্বস্ত দিশাহারা ভাবপ্রবণ নায়কের ক্ষেত্রে এও যেন এক অমোঘ ভবিতব্য। কিন্তু তবুও নিটোল ছোটগল্পের শিল্প বিচারে গল্পগুলোর ত্রুটি যাই থাকুন না কেন, গদ্য ভাষায় কাব্যময়তা, অনাবিল আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছলতার অনস্বীকার্য আকর্ষণ পাঠকদের সহজেই অভিভূত করে। প্রকৃতির অনুষঙ্গে নায়কের কবি-আত্মাকে তিনি নিভৃত তৃপ্তির আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। সেই ভাবানুষঙ্গই গল্পগুলির প্রেম-বিরহের অনুভূতি-মালাকে গল্পকার প্রকরণ সৌকর্যে সুগ্রথিত করে তুলতে পেরেছেন।

উদ্দাম আবেগ, উচ্ছল ভাষা প্রবাহ ও যৌবনের দুরন্ত শক্তির বন্দনা-এই তিনটি উপকরণ দিয়ে নজরুলের গল্প তৈরি। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' বা 'সবুজপত্রে'র ভাষার সঙ্গীতময়তার ধরন কিছুটা নজরুলের এই সব গল্পে থাকলেও তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের বন্ধনহীন স্বভাবানুযায়ী তা আরো চঞ্চল,

গতিময়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তা লক্ষ্যপথের একাগ্রতা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন-

"নজরুলের চরম রোমান্টিকতার শক্তি ছিল বিদ্রোহের। তাঁর কবিতায় যেমন একদিকে প্রবল নির্মোঘ ও অগ্নিস্রাবী ভাষাস্রোত-অন্যদিকে কোমল, সঙ্কুচিত নিভৃত সঙ্গীত গুঞ্জরন, তেমনই তাঁর গল্পেরও দুটি ধারা। কিন্তু দুটি আপাত বিরোধী ধারা একই রোমান্টিক প্রবাহের দ্বিধা বিভক্ত রূপমাত্র।"[৭৫]

কবি নজরুল আর গল্পকার নজরুলের এই দুটি আপাত বিরোধী ধারা একই চৈতন্যের সহোদর হয়ে ওঠার মূলেই রয়েছে, কবি নজরুলের রোমান্টিক ভাবতন্ময়তার গভীরত্ব। আর এরই জন্যে প্রকৃতির অনুষঙ্গ তাঁর প্রায় সব গল্পেরই ইমেজ ও থীমের সম্পর্ক রক্ষা করতে পেরেছে, তাঁরই কবি-আত্মার স্বভাব ধর্মে, প্রকৃতি চিত্রকল্পের প্রতীকী দ্যোতনায়।

"আমার গানের মালা আমি
করব কারে দান।
মালার ফুলে জড়িয়ে আছে
করুণ অভিমান।।
....
বিরহে যার প্রেম-আরতি
আঁধার লোকের অরুন্ধতী
নাম না জানা সেই তপতী
তার তরে এই গান।
মালা করনু তাদের দান।"[৭৬]

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমে কবি তাঁর মানস-প্রিয়ার গলে তাঁর রচিত গানের মালা পরিয়ে (‘তার তরে এই গান’) তাতে কবির তৃপ্তি সম্পন্ন হলো না। যে গানের মালা দিয়ে তিনি তাঁর অরুন্ধতি তপতীকে বরণ করেছেন, সেই মালা তিনি আবার সর্বজনীন ‘তাদের’ (‘মালা করনু তাদের দান’) দান করে তবেই তৃপ্তি পান। ‘শিউলিমালা’ গল্পে আজহার ও শিউলির শারদ প্রভাতে অঞ্জলি ভরে শিউলি ফুল জলে ভাসিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে প্রেমের যে সৌন্দর্য-স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে, তাতে সত্য-সুন্দরের পূজারী কবির শাশ্বত সৌন্দর্য সাধনারই পরিচয় ফুটে ওঠে। আসলে, নজরুল এই গল্পের মধ্য দিয়ে বাস্তবের সত্যকে চিরন্তন সুন্দরের সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন। বাস্তব সমগ্রতা দর্শনই তো সৌন্দর্য দর্শন। এই সৌন্দর্য-দর্শনের দার্শনিক কবি বলেই গল্পকার নজরুলও তাঁর চৈতন্য Realism, truth & Feeling-এর সমন্বয়ে সত্যের প্রেরণাকে সুন্দরে পরিণত করতে পেরেছেন।

পর্বাঙ্গ-ঘ

বিশ্বপ্রকৃতি ও শিল্পী প্রকৃতি

"দুর্বাসা হে! রুদ্র তড়িৎ হানছিলে বৈশাখে,
হঠাৎ সে কার শুনলে বেণু কদম্বের ঐ শাখে।

বজ্রে তোমার বাজল বাঁশী, বহ্নি হল কান্না হাসি,
সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী-মন সরে না কাজে।
তোমার নয়ন-ঝুরা অগ্নি-সুরেও রক্তশিখা বাজে।"

নজরুলের আর এক শ্রেণীর গল্প আছে, যেখানে তাঁর সদ্য যৌবনোদ্দীপ্ত প্রেমের গভীর গোপন মিলন-চঞ্চলতা ব্যর্থতার ইন্ধনে আগ্নেয়গিরির মতোই হয়ে ওঠে বিস্ফোরণোন্মুখ। কিন্তু তবুও সেখানে বিরহ-মাধুর্যের আদর্শ রক্ষার মন্ত্রসাধক কবি-স্বভাব, শেষ মুহূর্তে তাঁকে দিয়ে যায় ত্যাগের সংযম। দিয়ে যায় তাঁকে প্রেম-বিরহ পূজার এক শুদ্ধ ঋত্বিকের মর্যাদা। ব্যর্থ প্রেমের ব্যথাহত হৃদয় তখন তাকে প্রতিশোধের লাভা নিঃসরণের পরিবর্তে যেন নিষ্ক্রিয় এক মৌন গিরির ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। 'অগ্নিগিরি' ও 'জিনের বাদশা' গল্প দুটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। গল্প দুটির কাহিনী গল্পকারের কবি-ব্যক্তিত্বের লক্ষণ চিহ্নিত হয়েছে, প্রকরণগত সৌকর্যও লাভ করেছে। আর প্রকৃতির প্রয়োগ বা ব্যবহার গল্পগুলিকে যে অভীষ্ট লক্ষ্যাণুগামী করে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তার মধ্যে স্রষ্টার কবি চেতনার ফল্গুধারাস্রোতও অনুভব করা যায়।

"সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে, আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোনো বাধা-বন্ধন স্বীকার করিনি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমায় পথ ভুলায়নি, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।"[৭৭]

নজরুলের এই আত্মানুভবের প্রকাশ তাঁর 'অগ্নিগিরি' গল্পটিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। 'অগ্নিগিরি' গল্পের অগ্নিগিরি শব্দটি নজরুল প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন। শব্দটিকে প্রকৃতি থেকে তুলে এনে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে লেখক গল্পের ভাব-সত্যকে প্রকাশ করেন।

আসলে, Subjectivity ও Objectivity ব সমন্বয় নজরুলের দিব্য-দৃষ্টির যে স্ফুরণ ঘটায়, তাতে নজরুলের শিল্পী সত্তা হয় সমৃদ্ধ। বাস্তব দুঃখ-বেদনার ভার বহন করেও হৃদয়ের গহন কোণে যে স্বপ্ন কুসুমবৎ প্রস্ফুটিত হয়, তাকেই তিনি প্রভাতের আলোকচ্ছটায় ভাস্বর করে তোলেন। হাজার দুঃখ-বেদনা, অত্যাচার, উৎপীড়নেও মানবে বিশ্বাস তিনি হারাননি, পরন্তু মানুষের সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করে 'চরৈবিতি'র মন্ত্রে মানুষকে সমুখপানে এগিয়ে যাবার কুচকাওয়াজ ধ্বনি শোনান। তাঁর এই এগিয়ে চলার মন্ত্র দীক্ষিত মানুষই পদানত মানুষের কাছে নিয়ে আসবে তার স্বরাজ-স্বাধীনতা, ধ্বংস করবে উচ্চ-নীচ ও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। নজরুলের এই যে ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত শিল্পীর এষণা, এই যে অনুভূতির তীব্রতা, জীবন প্রেম, মানুষকে উন্নততর, মহত্তর করবার বিপুল ইতিবাচক আবেগ, এখানেই আমরা optimistic নজরুলের Realism-এর সন্ধান পেয়ে যাই। 'The touch of truth is the touch of life-এই সত্যের শিল্পমণ্ডিত সৃষ্টিতেই স্রষ্টা কবি নজরুলের শিল্পীসত্তা গঠিত। আর তাঁর এই কবি সত্তার স্বভাবী চৈতন্যই আমরা ভিন্নাঙ্গিকের সৃষ্টি কথাসাহিত্যেও সমচৈতন্যে একাত্মভূত হতে দেখি। যেমন-'অগ্নিগিরি' ও 'জিনের বাদশা' গল্প দু'টি।

"ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে কারা যেন ডাকে
বেরিয়ে এল নবীন পাতা পল্লব-হীন শাখে।।
ক্ষুদ্র আমার শুকনো ডালে/দুঃসাহসের রুদ্র ভালে
কচি পাতার লাগলো নাচন/ভীষণ ঘূর্ণিপাকে।।

স্থবির আমার ভয় টুটেছে/গভীর শঙ্খ রবে,
মন মেতেছে আজ নূতনের/ঝড়ের মহোৎসবে।
কিশলয়ের জয়-পতাকা/অম্বরে আজ মেলল পাখা
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো/অভয়-মহাত্মাকে।"
- বনস্পতির গান: নজরুল ইসলাম।

অগ্নিগিরি আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, কিন্তু অগ্নিগিরির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর আগ্নেয় লাভান্তর। ভূগর্ভের অভ্যন্তর তাপ ও চাপের প্রভাবে সে তার ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। মৌন-গিরি তখন ভয়ঙ্কর আগ্নেয় লাভায় হয় প্রকাশ-মুখর। 'আগ্নেয়গিরি' গল্পের নায়ক সবুরও শান্ত ধীর গিরি যেন। ধৈর্য, বিনয় আর মৌনব্রত পালনে সে যেন গিরির মতোই অচল-স্থিতধী। তাই বীররামপুর গ্রামের, পাড়ার রুস্তমী দলের ছেলেদের ক্রমাগত গঞ্জনা আর অত্যাচারের তীব্রতা দিনের পর দিন ধরেই সে সহ্য করে এসেছে। কিন্তু প্রথমে দুঃখ পরে মানবিক সহানুভূতির সূত্র ধরে, গোপন প্রেমের আন্তর তাড়নায়, নায়িকা নূরজাহান দেয় সবুরকে জ্বলে ওঠার অনুপ্রেরণা। (যা অগ্নিগিরির আন্তর তাপ ও চাপের প্রভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার সাদৃশ্যবাহী)-এই অনুপ্রেরণার প্রভাবেই সবুর একদিন রুস্তমী দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিল। তাতে তার গোপন বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রতিবাদে রক্ষিত হবে নূরের গোপন প্রেমের মর্যাদা। তাই-

"আজ চিরদিনের শান্ত সবুর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে ঝড় উঠেছে, মৌনী পাহাড় কথা কয় না, কিন্তু সে যদি কথা কয়, সেদিন হয়ে ওঠে অগ্নিগিরি।"[৭৮]

কবি নজরুলের পৌরুষদীপ্ত কবি-আত্মাটিও যেন এখানে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে তাঁর অগ্নিবীণার তারে-

"শোনাও তোমার মহা আহ্বান বাজাও প্রলয় শাঁখ
জাগো হে রুদ্র ধ্যান নিমগ্ন হে মৌন নির্বাক।
শঙ্কাহরণ জাগো নিশঙ্ক
ঘুচাও ক্লৈব্য মোহ আতঙ্ক
হীন ভীরুতার গ্লানি কলঙ্ক
চিরতরে মুছে যাক।"

সবুরের 'হীন ভীরুতার গ্লানি-কলঙ্ক চিরতরে মুছে' যাওয়ার সময় সমাগত। আজ রুস্তমীদলের ছেলেদের পথে পেয়ে 'রুদ্র ধ্যান নিমগ্ন' মৌন নির্বাক সবুর, পৌরুষের প্রখর দীপ্তি নিয়ে হলো সবাক। রুস্তমী দল আগে আক্রমণ করলে সবুর তার প্রতিরোধের প্রলয় শিখা বাজিয়ে উঠল। এতদিনের ক্ষুব্ধ অপমান সঞ্চিত লাভার উদ্গীরণের মতো প্রতিবাদের বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। একে একে সব ছেলেদের উত্তম মধ্যম প্রহারে শায়েস্তা করলো সে। কিন্তু শেষে আমির নামে একটি কিশোর তাকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করলে উভয়ের ধস্তাধস্তিতে আমিরের ছুরি আমিরেরই বুকে আমূল বিদ্ধ হয়। আমির মারা গেল। পুলিস সবুরকে বন্দী করে নিয়ে গেল। আমির হত্যার মিথ্যা অভিযোগেও কোনো প্রতিবাদ করে না সে। হাসিমুখেই বরণ করে নেয় খুনী অপবাদ।

অগ্নিগিরি তার অগ্ন্যুৎপাত-অস্তে যেমন হয় শান্ত, তেমনি পৌরুষদীপ্ত প্রতিবাদের পর এবং বিনা অপরাধে দীর্ঘমেয়াদি আসন্ন শাস্তির সম্ভাবনায় সবুরও হয়ে ওঠে আবার মৌনগিরি। তার তৃপ্তি-নূরজাহান প্রদত্ত প্রেমের

মর্যাদা সে প্রতিরোধের বিস্ফোরণে রক্ষা করতে পেরেছে। এই পরিতৃপ্তির জোরেই যেন সে আজ যে কোনো দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করার মতো শক্তি পেয়েছে। ঈপ্সিতা নূরজাহানের বিরহ-ব্যথাকে সগর্বে বরণ করে নেওয়ার যোগ্যতা এতে সে প্রমাণ করতে পারে। সবুরের বিরহ মাধুর্য উপভোগের এই আদর্শায়িত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবি নজরুলের প্রেম-বিরহের মাধুর্য প্রকাশের শাশ্বত আদর্শ যেন এই কয়টি পঙ্ক্তিতে একাকার হয়ে ওঠে-

"অনন্ত ধারা প্রেমের ঝর্ণা, কোথা লুকাইয়া ছিলে
উদাসীন গিরি পাষাণের হিয়া রস ভাসাইয়া দিলে।
পাথরের বিগ্রহ হয়েছিল নিস্তেজ আদি নর,
তেজোময়ী আদি-নারী সে পাষাণে কাঁপাইল থর থর।
নিষ্কাম ঘন অরণ্যে সেই প্রথম কামনা যুই,
আঁখি মেলি যেন দেখিল সৃষ্টি, হেসে এক হ'ল দুই।
এই দুই হয়ে দ্বন্দু আসিল, ছন্দ জাগিল পায়,
সোনাতে কাঁকরে দু'জনে মিলিয়া নুপুর বাজায়ে যায়।
সালাম লহগো, প্রণাম লহগো প্রকৃতি পুণ্যবতী
তব প্রেম দেখায়েছে গো চির আনন্দধামের জ্যোতি।"[৮০]

আপেক্ষিক দৃষ্টিতে নূরজাহানের লুকানো 'অনন্ত-ধারা প্রেমের ঝর্ণা'য় উদাসীন গিরি সবুরের একদা প্রেমহীন পাষাণ-হিয়া ভেসে গেল। তাই এই পুণ্যবতী প্রকৃতি প্রেমিকাকে সালাম জানিয়ে সে তার প্রেমের বিরহ-ব্যথাকে করে তুললো ভাবি পথ চলার পাথেয়, 'চির আনন্দধারার জ্যোতি'।

প্রাকৃতিক একটি শব্দকে (অগ্নিগিরি) গল্পের নায়করেই ব্যক্তি প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যবাহী করে গল্পকার নজরুল 'অগ্নিগিরি' গল্পটির নাম নির্দেশ করেছেন। আবার কবির লেখনীতেও পর্বত ও নির্ঝরের উপমা সঙ্কেতবাহীরূপে এসেছে। প্রসঙ্গত আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল-নজরুল কৈশোরে যখন দরিরামপুর (গল্পের বীররামপুর) হাইস্কুলে পড়তেন, তখন গ্রামের যে বখাটে ছেলেরা তাকে খুবই উত্যক্ত করতো, তাদের সেই দৌরাত্ম্যের স্মৃতিই বোধহয় প্রতিফলিত হয় 'অগ্নিগিরি' গল্পে। ফলে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে প্রাকৃতিক অগ্নিগিরির স্বভাব সাদৃশ্যকে তুলে ধরে, সবুরের আন্তর প্রকৃতিতে নজরুল স্বীয় কবি-প্রকৃতিকেই যেন উন্মোচন করেছেন। অগ্নিগর্ভ পর্বতের উপমা যেমন বাস্তব জীবন-নির্ভর গল্পে নায়কের সঙ্কটাদীর্ণ রূপকে ব্যঞ্জিত করেছে, পার্বত্য ঝর্ণাধারার চঞ্চল স্রোতের মধ্যে আবার প্রেমের প্রাণোচ্ছলতার ভাব প্রতিমা কবিত্ব ধর্মের আনুকূল্যে প্রকাশ পেয়েছে। একটি সূক্ষ্ম ভেদরেখা থাকা সত্ত্বেও 'অগ্নিগিরি' স্রষ্টা নজরুলের আগ্নেয় পৌরুষ আর পরিপ্লাবী প্রেমানুভবের রূপকার কবির অভিন্ন চেতনা আমাদের তাঁর সম্পর্কে কৌতূহলী করে। শিল্পীর নিজের উক্তির মধ্যেই রয়েছে এর সূত্র সন্ধান-

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য"।

'জিনের বাদশা' গল্পের নায়ক আল্লারাখা চাষী পরিবারের সন্তান। আল্লারাখা স্বল্প- শিক্ষিত, দুরন্ত। স্বগ্রামের কিশোরী চানভানুকে পাবার জন্য সে তাদের বাড়িতে অভিনব পন্থায় জিন-এর উপদ্রব শুরু করে। প্রথমে বিরূপ চানভানুও পরে ঘটনাক্রমে আল্লারাখার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন- "আল্লারাখা কাঁটার মতো তার

মনে এসে বিঁধতে লাগল। ...ও যে কালবৈশাখীর মেঘের মতো, যত ভয় করে, তত দেখতেও ইচ্ছে করে।"[৮১]

একদিন আল্লারাখা জলদানব সেজে, পুকুরে একাকী স্নানরতা চানভানুকে ভয় দেখায়। চানভানু অজ্ঞান হয়ে জলে পড়ে গেলে আল্লারাখা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চানভানু তার সজল করুণ দৃষ্টি আল্লারাখার প্রতি নিক্ষেপ করলে, আল্লারাখার ওপর চানভানুর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। চানভানুর বাবা-মা'র সকৃতজ্ঞ আশীর্বাদও চানভানু সম্পর্কে আল্লারাখাকে আশাবাদী করে। যৌবন-চঞ্চলতার আবেগদীপ্ত এই প্রত্যয়ে আল্লারাখার মন আনন্দে ভরে ওঠে-

"আল্লারাখা আনন্দে প্রায় উন্মাদ হয়ে নদীর ধারে ছুটে এলো। তখন চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশের সীমানা আলো করে। আল্লারাখার মনে হলো ও চাঁদ নয়, ও চানভানু, ওরই মনের আকাশ আলো করে উঠেছে আজ সে।"[৮২]

আল্লারাখার এই উদ্বেলিত যৌবনাবেগ গল্পকারেরই এই কয়টি পঙ্ক্তিতে যেন সমভাবাপন্ন হয়ে ওঠে-

"চাঁদ হেরিছে চাঁদমুখ তার সরসীর আরশিতে।"

কিংবা-

"বকুল চাঁপার বনে কে মোর চাঁদের স্বপন জাগালে।
অনুরাগের সোমার রঙে
হৃদয় গগন রাঙালে।
ঘুমিয়ে ছিলাম কুমুদ-কুঁড়ি
বিজন ঝিলের নীল জলে
পূর্ণশশী তুমি আসি
আমার সে ঘুম ভাঙালে।
'হে মায়াবী! তোমার মায়ায়
সুন্দর আজ আমার তনু
তোমার মায়া রচিল মোর
বাদল মেঘে ইন্দ্রধনু।
তোমার টানে, হে দরদী
দোল্ খেয়ে যায় কাঁদন নদী।
কুলহারা মোর ভালবাসা
আজকে কূলে লাগালে।"[৮৩]

-এই পর্যন্ত গল্পটি এগিয়ে গেছে চানভানু ও আল্লারাখার অরুণরাগে রঞ্জিত সরল প্রেমের স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু গল্পের নাটকীয় দিক পরিবর্তন ঘটে যায়, ছেরাজ হালদারের ছেলের সঙ্গে চানভানুর আসন্ন বিবাহকে কেন্দ্র করে। অবশ্য এর পরেও আল্লারাখা বিচিত্র কৌশলে চানভানুর পিতামাতার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ব্যর্থ হয়। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আল্লারাখা হয়ে উঠে উদাসী।

সে বোঝে, ভালবাসা মানুষকে প্রশান্ত করে, পবিত্র করে। মনে পড়ে যায় তার একদিনের ঘটনা। নিজের বুক চিরে রক্ত বের করে সেই বুকের রক্ত সর্প দংশনের ফল বলে ছলনা করেছিল চানভানুকে আল্লারাখা,- উদ্দেশ্য সহানুভূতি লাভ। উদ্বিগ্না চানভানু তার চাঁদমুখ আল্লারাখার বুকে রেখে, রক্ত চুষে আল্লারাখাকে বাঁচাতে চেয়েছিল-

"যেদিন চানভানু তার চাঁদমুখ দিয়ে ওর বুকের রক্ত স্পর্শ করেছিল সেইদিন থেকে তার রক্তের সমস্ত হিংসা, দ্বেষ, লোভ-ক্ষুধা সব যেন অমৃত হয়ে উঠেছিল।"[৮৪]

-সেই স্মৃতি স্মরণ করে আল্লারাখার মধ্যে ঘটে যায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সে হয় শান্ত, ধীর, উদাসী প্রেমিক। আল্লারাখার বুকে চানভানুর মুখের উত্তাপ আল্লারাখার জীবনে এই যে পরিবর্তন আনলো, তাতে তার হৃদয়ের নিভৃত আবেগটুকু নজরুল-কবিতার এই কয়টি পঙ্ক্তিতে ধরা দেয়-

"একদা যে নীল নভে উঠেছিল চাঁদ
ছিল অসীম আকাশ ভরা অনন্ত সাধ,
আজি অশ্রু-বাদল সেথা ঝরে অবিরাম॥"

কিংবা

"ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ।
অসহায় মনে কেন জেগেছিল ভালবাসিবার সাধ।।
কতজন আসে তব ফুলবন, ভ্রমর চাঁদের কিরণ,
তেমনি আমিও আসি অকারণ অপরূপ উন্মাদ।।
তোমার হৃদয় শূন্যে জ্বলিছে কত রবি-শশী-তারা,
তারি মাঝে আমি ধূমকেতুসম এসেছিনু পথ-হারা।
তবু জানি প্রিয়, একদা নিশীথে মনে পড়ে যাবে আমারে চকিতে
সহসা জাগিবে উৎসব গীতে সকরুণ অবসাদ।"[৮৬]

-'জিনের বাদশা' চানভানুর পিতামাতার অন্যত্র স্থিরীকৃত বিয়ের বিরুদ্ধে যদি দুষ্টু-কিশোর আল্লারাখার প্রতিরোধ বিষয়ক গল্প হতো, তবে এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনী উল্লেখযোগ্য হতো না। কিন্তু রোমিওর মতো নায়ক আল্লারাখার উত্তরণ গল্পটিকে গভীরতা ও প্রাণ দিয়েছে। এর মধ্যে মূল চরিত্রের বিকাশও লক্ষ্য না করে উপায় থাকে না। যেদিন চানভানুর বিয়ে হয়ে যায়, তার পরদিন প্রভাতে সবাই দেখে আল্লারাখাকে নতুন রূপে। তার মাথার সাধের বাবরি চুল আর নেই। পরণে গামছা, কাঁধে লাঙল, হাতে পাঁচনি। আল্লারাখার এই দৃশ্য দেখে শুধু তার মা-ই চোখের জল ফেলে না, ফেলে পাঠকও। আর-

"দূরে হিজল গাছের তলায় আরো দুটি চোখ আল্লারাখার কৃষাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে সেদিনকার প্রভাতের মেঘলা আকাশের মতোই বাষ্পাকুল হয়ে উঠল, সে চোখ চানভানুর। সে দৌড়ে গিয়ে আল্লারাখার পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল, 'কে তোমারে এমনডা করলে? আল্লারাখা শান্ত হাসি হেসে বলে উঠল, 'জিনের বাদশা।"[৮৭]

গল্পটির এই করুণ পরিণতি গল্পকারের এই কয়টি পঙ্ক্তিতে যেন একাত্ম হয়ে ওঠে-

"..
চাঁদনী তিথি এল, আমারি চাঁদ কেন এল না
বনের বুকের আঁধার গেল গো মনের আঁধার গেল না।
এ মধু নিশি মিলন মালায়
কাঁটারই মত আমি বিধিয়া আছি হায়!
সবারই আলয়ে আলোর দেয়ালি,
অশ্রু আমারি নয়ন পাতে।"[৮৮]

'জিনের বাদশা' গল্পে আল্লারাখার প্রেম-পিপাসার অতৃপ্তিজনিত করুণ পরিণতির সঙ্গে কবি নজরুলের বিষাদমুখর বিরহ-সন্তাপ এখানে একাত্ম হয়ে ওঠে। গল্পকার নজরুল গীতিকাব্যোচিত বিষাদঘন করুণ ব্যঞ্জনাবহ ট্র্যাজিক পরিণতির আবহর মধ্য দিয়েই এই গল্পে ঘটান ট্যাজিক পরিণতি। আর এই ব্যঞ্জনাবহ ট্র্যাজিক পরিণতির মূলে রয়েছে গল্পকারেরই কবিআত্মার সাধর্ম। আর তাঁর কবি-মন গল্পটিতে যে প্রকৃতির অনুষঙ্গ এনেছে, তাতে এই গল্পের করুণ পরিণতি যেমন আরো গাঢ়তর হয়েছে, তেমনি গল্পটিও পেয়ে গেছে ছোটগল্পের উত্তরণের পথ। 'ব্যথার দান' গল্পে, দারার মুখ দিয়ে গল্পকার নজরুল বলেন, 'দুনিয়ার যত রকম আনন্দ আছে, তার মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আনন্দময়।' 'জিনের বাদশা' গল্পেও আল্লারাখার পরিণতিতে যে বিষাদময়তার অভিযোজন পরিলক্ষিত, তাতে নজরুলের উদ্দীষ্ট বিশিষ্ট ভাবনাটিই ধরা পড়ে।

নজরুলের চেতনায় বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ কম। আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতিতে নজরুল কোনো সত্তা আরোপ করেননি। ইংরেজ কবির মতো স্কাইলার্ক বা নাইটিঙ্গলকে অসীম আকাশে উড়িয়ে দিয়ে, মহত্তর কোনো সত্তার প্রতি ধাবমান হবার প্রয়াসও নজরুলে তেমন নেই। তবে, প্রকৃতি নজরুলের প্রেমাভিজ্ঞতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কবি তাঁর প্রিয়াকে দেখেছেন প্রকৃতির মধ্যে। যেমন 'দোলনচাঁপা', 'চক্রবাক', 'ছায়ানট' কাব্যে। প্রকৃতি আর প্রিয়া তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাকার হয়ে গেছে তাঁর শিল্পীসত্তায়। 'বাদল বরিষণে', 'সাঁঝের তারা', 'শিউলিমালা' প্রভৃতি গল্পেও নজরুলের প্রকৃতিচেতনার এই বিশিষ্টতা উপস্থিত।

নজরুল তাঁর গল্পে বহির্জগতের কোনো একটি বিষয়কে স্বীয় ব্যক্তি-স্বভাবানুযায়ী সঞ্চয় করে, যে প্রতীতি (Impression) গড়ে তোলেন, তাকে তিনি তাঁর কবিত্ব স্বভাবের প্রভাবেই অনুভূতি ও জীবনবোধের দ্বারা একটা বিশেষ রূপ দিয়ে প্রকাশ করেন নতুনরূপে। অবশ্য, শিল্পসম্মত ছোটগল্পে প্রকৃতি যেভাবে সমগ্র গল্পের ভাব-সত্যবাহী হয়ে ওঠার ইঙ্গিতময়তা দান করে, সেইরূপ সামগ্রিক নিটোল ইঙ্গিতময়তায় নজরুলের প্রকৃতি-চেতনা তাঁর গল্পগুলিকে ছোটগল্পের ভাবৈক্য দান করতে পারেনি। তাঁর রোমান্টিক কবি-আত্মার অত্যধিক ভাবোচ্ছ্বাস প্রকৃতির ডানায় চড়ে ভাব-সত্যের সৌন্দর্যবোধ নির্মাণের দিকে ধাবিত হয়েছে। আবার, প্রকৃতি চেতনাকে কেন্দ্র করে, ছোট গল্পের 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা'র সম্পর্ক যে তীক্ষ্ণ প্রশ্নমূলকতা সমাজ সচেতন ছোটগল্পের প্রধান প্রেরণা হয়ে ওঠে, সেই ধরনের শৈল্পিক সংযম নজরুলের গল্পে তেমন নেই। তাঁর গল্পে কবিত্বের আবেগময়তা, প্রকৃতিকে 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'র সঙ্কেতধর্ম দান করেনি। তাঁর ছোটগল্প দান করেছে আবেগের উচ্ছ্বাস-স্রোতে ভেসে যাওয়া কবির বিরহ ব্যথার মাধুর্য।-

"মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিন চাঁদের জোছনা কেমন ছিটেফোঁটা হয়ে পড়ছে সারা বনটার বুকে। এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতাবাঘের মতো দেখাচ্ছে।"[৮৯]

-পূর্ণিমার চাঁদ ও তার ছিটেফোঁটা আলো, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিবেশস্থিত বনটার সঙ্গে নজরুলের বিষাদ-ঘন বিরহী-আত্মার বিষাদ মিশে যেন হয়ে উঠেছে চিতাবাঘ। এইভাবে নজরুলের গল্পে প্রকৃতি নিছক নিসর্গ সন্দর্শনের সৌন্দর্যে ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে গল্পকারের মানস জগতের প্রতীক হয়ে। আর এই প্রতীক গল্পের প্রতীতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে, গল্পগুলির পরিণতিকে দিয়েছে যেন গীতিকাব্যোচিত ব্যঞ্জনা মাধুর্যের রসাস্বাদন। সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন-

"তাঁর মন-মৌমাছি বিশ্ব-প্রকৃতির প্রস্ফুটিত পুষ্পে গুঞ্জরণ করিয়াছে সত্য, হয়ত পুষ্পপরাগে কিছুদিনের পথ গুটাইয়া বাঁধাও পড়িয়াছে, কিন্তু সেই প্রকৃতি প্রেমের মধ্যে হইয়াছে তাঁর নতুন উপলব্ধি, নতুন অভিজ্ঞতা।"[৯০]

-নজরুলের প্রকৃতি প্রেম-জাত এই নতুন উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এমন-

(ক) "বাইরে আমি এতটা নিষ্করুণ নির্মম হলেও আমার যে এই মরু ময়দানের শুকনো বালির নিচে ফল্গুধারার মতো অন্তরের বেদনা, তার জন্যে করুণায় একটি আঁখিও কি সিক্ত হয় না?"

-এখানে বেদনার বিশেষণ মরু ময়দানের শুকনো বালির (ঘুমের ঘোরে) নিচে ফল্গুধারার মতো-উপমা প্রয়োগ সার্থক হয়ে উঠেছে।

(খ) "একটু সামনে এক টুকরো টাটকা কাটা কজের মতো এই সন্ধ্যাতারাটি ফুটে উঠে।" (অতৃপ্ত কামনা)

-এখানে সন্ধ্যাতারার বিশেষণ 'এক টুকরো টাটকা কাটা কল্পের মতো' উপমায় সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

(গ) "একটু আগের বর্ষা-ধোওয়া ছলছলে আকাশ, যেন একটি বিরাট নীলপদ্ম। তারই মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি। চারপাশে তারা যেন আলোকভ্রমর। .... শিউলির সাথে রজনীগন্ধার গন্ধে মেশা হাওয়া, মাঝে মাঝে হলঘরটাকে উদাস মদির করে তুলেছিল।" (শিউলিমালা)

-এখানে গল্পের আবেগদীপ্ত ভাষায় পদ্ম, চাঁদ, তারা, ভ্রমরের ব্যবহার তো কবি নজরুলেরই কবি-প্রসিদ্ধিতে হয়েছে। যদিও এটি গল্পের গদ্য ভাষা, তবুও এই অংশটুকু যেন তিনি এইভাবে লিখতে পারতেন- 'চাঁদ তারা খচিত বর্ষা-ধোওয়া শরতের আকাশকে একটা বিরাট নীল পদ্মের মতো দেখাচ্ছিল।' এরকম লিখলে হয়তো সেটাও খুব সাধারণ উপমা হতো না। কিন্তু নজরুল উপমাটিকে ভেঙে আরও চিত্রানুগ বা সুস্পষ্ট ছবি করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কাহিনীর ঘটনাকে কিছুক্ষণ আড়াল করে তিনি পাঠকের চোখকে একটি দৃশ্যের প্রতি বেশি করে মনোযোগী করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন-আমরা সাধারণভাবে প্রকৃতিকে যেভাবে দেখি, সে দেখারও অতীত কিছু দর্শনীয় আছে। আর দেখানোর কৌশলটাই উপমাটিকে দিয়েছে অভিনবত্ব, গল্পটিকেও দিয়েছে লিরিকের ব্যঞ্জনা।

(ঘ) "চখা হরিণীর মত ভীতত্রস্তা চাউনি দিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে আচমকা আর্ত ব্যাকুল স্বরে কেঁদে উঠল।' (বাদল বরিষণে)

-নজরুল এখানে লিখতে পারতেন- 'হরিণীর মত চাউনি দিয়ে'। কিন্তু এখানে শুধু 'হরিণী' নয়-'চখা হরিণী' এবং সাধারণ চাউনি নয়, 'ভীতত্রস্তা চাউনি' উপমাটির তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

(ঙ) “সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে তার চোখে ফুটে উঠতে লাগল সেই দুটি চোখ, দুটি তারার মত। প্রভাতী তারা আর সন্ধ্যা তারা।"[৯১]

-প্রভাতের তারার রূপ আর সন্ধ্যার তারার রূপ এক নয়। অন্ধকার ভেদ করে ফুটে ওঠা দুই চোখের রূপও এক নয়। শিল্পী নজরুলের হাতে এখানে দুটি পৃথক সময়ের তারা, দুটি পৃথক রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে।

-এইভাবে আমরা দেখি, নজরুলের গল্পের ভাষা প্রসাদগুণ প্রাপ্ত হয়েছে তাঁর উপমা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই। আর প্রায়শই প্রকৃতি হয়েছে তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপমা সৌকর্যের আলম্বন। নজরুল ‘পদ্মগোখরো’ গল্পের দু’ একটি জায়গায় দৃশ্যরূপ এঁকেছেন যেন সেলুলয়েডে আঁকা কাব্যিক ছবিতে। যেমন-

"দু’দিন আগের ঝড়ে ঘরের কতকগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই আকাশপথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্রকিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ি সমস্ত অলঙ্কারগুলি পোঁটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল....।"[৯২]

-এখানে প্রকৃতির অনুষঙ্গে গল্পের পাত্র-পাত্রীর মানসস্তরের উন্মোচন লক্ষ্যণীয়। গল্পের আরেকটি জায়গায় দেখা যায়-

"শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।"[৯৩]

-এখানে কবি-জনোচিত বাক্য-ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেখানে মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে বহিঃপ্রকৃতির রূপে। হৃদয়ের রক্ত ও কৃষ্ণচূড়াকে মেলানো হয়েছে। বিষ্ণু দে’র কবিতায় এই কৃষ্ণচূড়া ইমেজেরই ব্যবহার পাই-

"কৃষ্ণচূড়া রাঙে, সেও তো হাহাকার
আমারই হৃদয়ের কান্তি ও-।"

-গভীর সমাজবাস্তবতার জ্ঞানশিল্পী নজরুলকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। গল্পকার নজরুলেও তার প্রভাব স্পষ্ট। যেমন-’রাক্ষুসী’। নজরুল এই গল্পকে ছোটগল্পের মর্যাদায় শিল্পোত্তীর্ণ করেছেন তাঁর গভীর সমাজবাস্তবতার জ্ঞান দিয়েই। গল্পটির মূল থীম যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তা হলো স্ত্রীর হাতে স্বামীর হত্যা। এই হত্যাদৃশ্যের উপস্থাপনা কৌশল, উচ্চকল্পনাপ্রসূত। স্বামীকে আবাগীর বাড়ির পেছনের তেঁতুল গাছটার তলায় বসে থাকতে দেখেই স্ত্রী বিন্দি বলছে-

"দা-টা বের করে নিলুম, সাঁঝের সূর্যটার লাল আলো দা-টার ওপর পড়ে চকমক করে উঠল। ঐ ঝাপসা রোদেই আবার বৃষ্টি নেমে এল রিম্-ঝিম্-ঝিম্।"[৯৪]

-এখানে ক্রোধের প্রতীকী লালবর্ণ আলো আর দুঃখের কান্নার বৃষ্টি অনুপম-ভঙ্গিতে মিলেমিশে গেছে। হত্যার পর, অজ্ঞানতা কাটার পর, জেলের জীবনে ধাতস্থ হবার পর, সেই সূর্যালোকের রং হয়েছে ‘সাদা’। তখনো-‘চোখের পাতায় শুধু একটা (লাল) রং ধূ-ধূ করত।‘ এ তো কোন শত্রুপক্ষকে নিধন করা নয়, আত্মপক্ষকেই নিহত করা। তাই সারা জীবন এবার স্বামীর মৃত্যুদশা তাকে কুরে কুরে খাবে আর পাগল করে

দেবে, আর লোকের চোখে সে হয়ে উঠবে রাক্ষুসী। স্বামীর প্রতি স্নেহভরা প্রেম ছলকে ওঠে অতীত উদ্ভাসে- 'এত রক্তও থাকে গো এতটুকু মানুষের দেহে?' -এই উচ্চারণের মধ্যে 'এতটুকু' শব্দের ওজনও কম নয়। এখানেই লুকিয়ে আছে স্বামীর প্রতি তার সকরুণ প্রেমস্মৃতি, স্নেহ ভরা টান। এখানে গল্পের অন্তর্বয়নের সঙ্গে ছোট গল্পের বিষাদমেদুর জীবনার্তি, মানবতার মূর্ত প্রতীক গল্পকার, তাঁর গীতি কবির অন্তর্লোক থেকেই ফুটিয়ে তুলেছেন সার্থকভাবে।

কামনসাক্ত প্রেম ও কামনারহিত প্রেমের মধ্যে নিজস্ব মানসমুক্তিতে যে সব গল্প নজরুল লিখে গেছেন, সেখানেই তাঁর যৌবন-উদ্দীপ্ত কবি-ভাবনার রোমান্টিক কাব্যানুভূতির জগৎ তথা আত্মবিচ্ছুরণের (Self-projection) নিজস্ব ভূমিটুকু খুঁজে পাওয়া যায় বেশি। তাই গল্প লিখতে লিখতে যেন নজরুল কবিতা লিখেছেন। যে সব গল্পে নজরুলের কবি-আত্মা প্রকৃতি ও মানব স্বভাবের অসামান্য সম্পর্ক-ভাবনায় আত্মোক্তির আয়না হয়ে উঠেছে, (যেমন-'শিউলিমালা', 'সাঁঝের তারা', 'বাদল বরিষণে') সেখানেই তাঁর অভিব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু যেসব গল্প একই সঙ্গে প্রকৃতি চেতনায়, কখনো আবেগ ও অনুভূতির প্রাধান্যে গঠিত হয়েছে, কখনো গঠিত হয়েছে চরিত্র ও ঘটনাসংঘাতমূলক গঠনে অন্বিত-সেই সকল গল্প প্রায়শই ভাব-ঐক্যের কেন্দ্র থেকে হয়েছে ভ্রষ্ট। যেমন-'রিক্তের বেদন', 'ব্যথার দান', 'অতৃপ্ত কামনা', 'হেনা' প্রভৃতি। এই গল্পগুলি ছোট গল্পের শিল্পবিচারে যে ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তবুও বিশেষ করে 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি সম্পর্কে সমালোচকের প্রশংসা স্মরণ করতে হয়।-

"ব্যথার দান-একটি গদ্য কাব্য। তরুণ কবির ব্যথাভারাতুর যৌবনের অর্ধনগ্ন স্মৃতির রাগরক্তে অনুরঞ্জিত কাহিনী এই কাব্যের কথাবস্তু।"[৯৫]

শুধু 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থেই নয়, 'রিক্তের বেদন', 'শিউলিমালা', 'পদ্মগোখরো', গল্পগ্রন্থের মূল সুরও কবি-আত্মার ঐ ব্যথা-ক্রন্দন। রবীন্দ্র মানসের অধিনায়কত্বের যুগে বসেও নজরুল তাঁর প্রকৃতি-চেতনার আন্তর গূঢ়বোধের কমনীয়তা এনে যে স্বকীয়তা প্রদর্শন করেছেন, তাতে তাঁর গল্পগুলি মৌলিক প্রকরণ-সৌকর্য লাভ করেছে। প্রত্যেকটি গল্পকেই তিনি প্রকৃতি ও মানব স্বভাবের অসামান্য সম্পর্ক ভাবনার দক্ষ ছবিতে উদ্ভাসিত করেছেন। নজরুল তাঁর গল্পগুলিকে প্রকৃতির চিত্রকল্পে প্রেম-বিরহের একটা চিরন্তন বিষাদময় রূপকে, আবেগের অকৃত্রিমতায় রূপ দান করেছেন। রবীন্দ্র ভাবলোকে লালিত হয়েও স্বীয় ব্যক্তিস্বভাবের অনুকূলে তিনি গল্পগুলিকেও অভিনবত্ব দান করেছেন।

পাশাপাশি এই সত্য স্বীকার করতেও দ্বিধা নেই যে, নজরুলের অনেক কবিতার মতো তাঁর অধিকাংশ গল্পই ছোটগল্পের শিল্পমূল্য বিচারে নিটোল নিখুঁত রূপ ধরতে পারেনি। তাঁর ভাবের মদিরা গঠনের পানপাত্রে যেন ধরতে চায় না, তার উদ্বেল ফেনরাশি পাত্রকে যেন ছাড়িয়ে যেতে চায়। তাঁর সাহিত্যিক বিচারে নজরুলের গল্পগুলি উৎকর্ষ লাভ করেনি। কিন্তু উৎকর্ষ লাভ করেছে ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান হয়ে। কেননা, রবীন্দ্রলালিত লেখক গোষ্ঠী ও বাংলা গল্পের অন্যান্য ঐতিহ্যপুষ্ট লেখকগোষ্ঠীর থেকেও তাঁর স্বাদের বিষয় আর টেনিক্ ভিন্ন গোত্রীয়। নব আস্বাদে তা তৃপ্তিদায়ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

"....যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে অশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ।"[৯৬]

-নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের পরিণত মুহূর্তের লেখা 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থ। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে প্রতিফলিত তাঁর প্রেম-বিরহের বিষামৃত পানের তৃপ্তি, তাঁরই কবিত্ব স্বভাবের আনুকূল্য নিয়ে প্রেমের বিরহ-আদর্শের শাশ্বত রসাস্বাদন করায়। আর কবি নজরুলের প্রকৃতি প্রেম, বিরহের সেই শাশ্বত আদর্শের যে মাধুর্য দান করে, তাও যেন ঈপ্সিত অসীমেরই রসাস্বাদন। অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণতা, শিল্প নির্মাণে অসংযমীর খামখেয়ালি ভাবের জন্য ছোটগল্পের শিল্পমূল্য বিচারে নজরুলের অনেক গল্প হয়তো সার্থক হতে পারেনি, তবুও নজরুলের প্রকৃতি প্রতীকত্বের অন্তঃশীল ব্যঞ্জনা গল্পের ভাব-সত্যে মিশে গিয়ে তাঁর গল্পগুলিকে চিরন্তন জীবন-সত্যের রসাস্বাদন লাভের মাধ্যমে করে তোলে। গল্পকার নজরুলের অন্তর্লোকে কবি-নজরুলের রোমান্টিক অভীপ্সা মিশে গিয়ে তাঁর শিল্পী মানসের অভিন্নতাই প্রমাণ করে।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-মন একসূত্রে গাঁথা। মানুষের স্পর্শাতুর চিত্তে প্রকৃতির প্রভাব ও তার সম্পর্ক-সূত্র অবশ্যম্ভাবীরূপে আপতিত। এই সম্পর্ক-সূত্র ধরেই কবি, পাঠকের সঙ্গে সম্পর্কের মালাটি গেঁথে নেন যেন-

> "বিনিসূতি মালা গাঁথিছে নিতুই এপার ওপর দিয়া,
> বাঁকা ফাঁদ পাতি টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া।"[৯৭]

-আসলে প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন না এমন কবির সংখ্যা খুবই অল্প। আবার প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যাও অধিক নয়। যেমন-উইলিয়াম ওয়ার্ডওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০)। কিন্তু Wordsworth-এর পঞ্চেন্দ্রিয়-সাক্ষী সুন্দরী প্রকৃতি নজরুলের সৃষ্টিতে খুব বড় একটা স্থান লাভ করেছে তা নয়, প্রকৃতির প্রভাব তিনি তাঁর কবিত্বের স্বভাবেই গ্রহণ করেছেন। জীবন-রসের রসিক কবি নজরুল প্রকৃতি প্রেমেও মাঝে মাঝে স্বপ্নমদির বিহ্বলতা অনুভব করেছেন। প্রকৃতির রূপ বর্ণনার চেয়ে তাঁর কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে প্রকৃতি-প্রেমের উদ্দীপনা। আর সেই প্রকৃতিকেই দেখা গেছে মানব-মনের আন্তর প্রকৃতির উন্মোচনে উদ্দীপকের ভূমিকায়। কবি নজরুলের প্রকৃতির এরূপ ভূমিকা তাঁর গল্পগুলিকেও প্রভাবিত করে এবং কবি ও গল্পকারের সমচৈতন্যের সাদৃশ্যবাহী হয়ে ওঠে।

তথ্য সূত্রঃ

১. 'নজরুলের কাব্যে নারী': আরিনা বেগম, সূত্র-শতবর্ষের আলোকে নজরুল-দেবেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি। ১ম সংস্করণ-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৫০

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সূত্র-'নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী'-শাহনাজ মুন্নী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা। ১ম সংস্করণ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৩

৩. 'নারী': 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ, নজরুল ইসলাম।
৪. 'নারী': 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ, নজরুল ইসলাম।
৫. 'নজরুল প্রেম সম্ভার': সম্পাদক আব্দুল আজীজ আল্ আমান-এর সম্পাদকীয় বক্তব্য। হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৯।
৬. John Keats.
৭. আধুনিক বাংলা কবিতা: মোহিতলাল মজুমদার।
৮. 'অ-নামিকা': 'সিন্ধু-হিন্দোল কাব্যগ্রন্থ'-নজরুল ইসলাম। 'সঞ্চিতা', ডি. এম. লাইব্রেরী, সপ্তচত্বারিংশৎ সংস্করণ-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৩২
৯. 'ঘুমের ঘোরে': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৪৬
১০. নজরুলগীতি (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ-২০০৪, পৃষ্ঠা-২৫
১১. 'রিক্তের বেদন': 'নজরুলের গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৮৯
১২. 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য: মধুসূদন দত্ত, প্রথম সর্গ, বিরহ-২
১৩. 'নজরুল রচনা সম্ভার': আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী (৭ম খণ্ড), পৃষ্ঠা-২৫৫
১৪. 'নারী'-নজরুল ইসলাম: সূত্র-'নজরুল রচনা সম্ভার' সম্পাদনা ও প্রকাশনা-প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-২৫৫
১৫. 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার': ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ সংস্করণ-১৯৮৯ ১৬. 'নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী'-শাহনাজ মুন্নী। নজরুল ইনস্টিটিউট। ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭
১৭. 'পরীর কথা': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৫২
১৮. 'অনন্ত প্রেম': 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৯. গীতিআলেখ্য: সূত্র-নজরুল রচনা সম্ভার (৪র্থ খণ্ড), আ.আ.আ. আমান্ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা-১৬২
২০. 'অতৃপ্ত কামনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র' - সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-৬২
২১. 'এ মোর অহঙ্কার': 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থ, কাজী নজরুল ইসলাম।
২২. নজরুলগীতি (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ - ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৩৫
২৩. 'মেহের নেগার': 'নজরুলের গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১০৯
২৪. 'মেহের নেগার': 'নজরুলের গল্প সমগ্র', সাহিত্যম প্রকাশন, পৃষ্ঠা: ১১১-১১২
২৫. 'বারাঙ্গনা'-সাম্যবাদী: 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ-নজরুল ইসলাম।
২৬. 'বধূ-বরণ': 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ। নজরুল ইসলাম।
২৭. 'ঘুমের ঘোরে': 'নজরুল গল্প সমগ্র', -সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-৪৭

২৮. চণ্ডীদাসের পদাবলী।
২৯. 'নজরুল রচনা সম্ভার' (৪র্থ খণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১৫৬
৩০. 'গোপন প্রিয়া': 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্য। সঞ্চিতা, পৃষ্ঠা-১২৯
৩১. 'অগ্নিগিরি': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১৮৯
৩২. 'কুমারসম্ভবম্': কালিদাস।
৩৩. নজরুলগীতি (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১৩৮
৩৪. 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১৪ ৩৫. 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১৪
৩৬. 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১৪
৩৭. 'ব্যথার দান': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১২
৩৮. নজরুলগীতি (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১৩৮
৩৯. 'স্তব্ধ রাতে': 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ-নজরুল ইসলাম।
৪০. 'স্তব্ধ রাতে': 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ-নজরুল ইসলাম।
৪১. 'ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন': শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় বক্তব্য, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।
৪২. 'নজরুল কাব্যে প্রেম': আব্দুল কাদির। 'রোববার' পত্রিকা, প্রকাশ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।
৪৩. 'নজরুল কাব্যগীতি': সূত্র 'নজরুল রচনা সম্ভার' (৬ষ্ঠ খণ্ড), আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত, 'হরফ প্রকাশনা',পৃষ্ঠা-১০৬
৪৪. 'গোপন প্রিয়া': ' সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ। নজরুল ইসলাম।
৪৫. কল্লোল (১ম বর্ষ) জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ।
৪৬. 'সওগত যুগে নজরুল ইসলাম': মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১৯৮৮,
৪৭. 'সমকালে নজরুল ইসলাম': মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-২৭৪
৪৮. 'বুলবুল' (২য় খণ্ড): ৪৫ নং গান, কাজী নজরুল ইসলাম।
৪৯. 'রাজবন্দীর চিঠি': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা:৭৪-৭৫
৫০. 'নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী': শাহনাজ মুন্নী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩৭
৫১. 'নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী': শাহনাজ মুন্নী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রথম

সংস্করণ-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫৫

৫২. ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম প্রকাশনা, পৃষ্ঠা-৯৭ ‘

৫৩. ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’: নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৯৭

৫৪. ‘বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৯৮

৫৫. ‘নজরুল কাব্যগীতি’: সূত্র ‘নজরুল রচনা সম্ভার’ (৫ম খণ্ড), আব্দুল আজীজ আল্ আমান সম্পাদিত, ‘হরফ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-১০১

৫৬. ‘পূজারিণী’: ‘দোলনচাঁপা’ কাব্য, কাজী নজরুল ইসলাম।

৫৭. ‘উৎসর্গ’: কাজী নজরুল ইসলামের ‘উৎসর্গ’ কবিতার শীর্ষে স্বয়ং নজরুলের উক্তি।

৫৮. ‘পদ্মগোখরো’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫১

৫৯. ‘পদ্মগোখরো’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৫১

৬০. ‘নারী’ সাম্যবাদী: ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থ: নজরুল ইসলাম।

৬১. উৎসর্গঃ কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-নজরুল রচনা সম্ভার (৬ষ্ঠ খণ্ড), আব্দুল আজীজ আল আমান্ সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা-৪৪

৬২. ‘স্বামীহারা’: নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১২৯

৬৩. ‘স্বামীহারা’: নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১৪১

৬৪. ‘বিশ্বাস ও আশা’: কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-’নজরুল রচনা সম্ভার’ (৭ম খণ্ড), পৃষ্ঠা-২৬৬

৬৫. ‘বিশ্বাস ও আশা’: কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-২৬৬

৬৬. ‘স্বামীহারা’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১৪২

৬৭. ‘বিশ্বাস ও আশা’: কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-’নজরুল রচনা সম্ভার’ ৭ম খণ্ড, আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ সম্পাদিত ও হরফ প্রকাশনী। পৃষ্ঠা-২৬৬

৬৮. ‘বিরহ-বিধুরা’: কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫

৬৯. ‘রাক্ষুসী’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-১২৫

৭০. ‘বুলবুল’ (২য় খণ্ড): কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, এ.কে.এম. আব্দুল আলিস। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-১৯৭৩, পৃষ্ঠা-১৪৭

৭১. ‘রাক্ষুসী’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা: ১২৩-১২৪

৭২. ‘বধূ-বরণ’: সিন্ধু-হিল্লোল-কাব্য। কাজী নজরুল ইসলাম।

৭৩. ‘রাক্ষুসী’: ‘নজরুল গল্প সমগ্র’, সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১২২

৭৪. ‘নারী’-সাম্যবাদী: ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।

৭৫. ‘বধূ-বরণ’: ‘সিন্ধু-হিন্দোল’-কাব্য। কাজী নজরুল ইসলাম।

৭৬. ‘নারী’-সাম্যবাদী: কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, সপ্তচত্বাবিংশৎ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৯

৭৭. 'নারী'-সাম্যবাদী: কাজী নজরুল ইসলাম। সূত্র-প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-৭৯
৭৮. 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
৭৯. 'নজরুল প্রতিভা': মোবাশ্বের আলী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৮০. 'আলতা-স্মৃতি': 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থ-কাজী নজরুল ইসলাম।
৮১. 'মেহের নেগার': 'নজরুল গল্প সমগ্র',সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১০৫
৮২. 'মেহের নেগার': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-১১০
৮৩. 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ, কাজী নজরুল ইসলাম।
৮৪. 'নজরুলগীতিকা'য় অন্তর্ভুক্ত 'জাতীয় সঙ্গীত' শিরোনামের ১৭নং গান। নজরুল ইসলাম।
৮৫. 'গানের আড়ালে': 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
৮৬. 'রিক্তের বেদন': 'নজরুল গল্পসমগ্র', সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা-৮৯
৮৭. 'রিক্তের বেদন': কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র (১ম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি ২য় সংস্করণ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩২৭
৮৮. 'অ-নামিকা': 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ-কাজী নজরুল ইসলাম।
৮৯. 'অতৃপ্ত কামনা': কাজী নজরুল ইসলাম।
৯০. 'নজরুলগীতি' (অখণ্ড): আব্দুল আজীজ আল্ আমান্ ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১৫১
৯১. 'রাজবন্দীর চিঠি': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৭৫
৯২. 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
৯৩. 'রাজবন্দীর চিঠি': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা-৭৫
৯৪. 'বিজয়িনী': 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
৯৫. 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।
৯৬. 'রাজবন্দীর চিঠি': কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ২য় সংস্করণ-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩১২
৯৭. 'পূজারিণী': 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ। কাজী নজরুল ইসলাম।